হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালাম

মুফতী মনসূরুল হক

মাকতাবাতুল মানসূর
www.darsemansoor.com
www.islamijindegi.com

সূচীপত্র

ফেরাউন ও তার কওমের নাফরমানীর শাস্তি
মুসা ‘আলাইহিস সালামের পরিচয়
মুসা ‘আলাইহিস সালাম যেভাবে লালিত-পালিত হলেন
মুসা ‘আলাইহিস সালামকে মিসর ছাড়তে হলো
দীনের দাওয়াত নিয়ে ফেরাউনের দরবারে মুসা ‘আলাইহিস সালাম
মুসা ‘আলাইহিস সালামের মুজিযা
মুসা ‘আলাইহিস সালামের মুজিযা ও ফেরাউনের যাদু
যাদুকরদের পরাজয় ও ঈমান গ্রহণ
ফেরাউনের দীনবিমুখতা ও ভয়-আতঙ্ক
ফেরাউন ও তার কওমের উপর আপতিত আযাব
ফেরাউনের কওমের উপর দুর্ভিক্ষের আযাব
ফেরাউনের কওম ঈমান গ্রহণে বারবার ওয়াদা ভঙ্গ করলো
আযাব যেভাবে ফেরাউনের কওমকে ধ্বংস করলো
ফেরাউনের ঘটনা পরবর্তীদের জন্য শিক্ষা
বালআম বাউরার শাস্তি : মুমিনদের জন্য শিক্ষা
বালআম বাউরার দু‘আ ও তার পরিণতি
যিনার কারণে যেভাবে আযাব এলো
আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গ: এক
আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গ: দুই
আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গ: তিন
বালআম বাউরার ঘটনা থেকে শিক্ষা

باسمه تعالى

ফেরাউন ও তার কওমের নাফরমানীর শাস্তি

আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُّوسٰى بِاٰيَاتِنَا اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِه فَظَلَمُوْا بِهَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ○ وَقَالَ مُوْسٰى يَا فِرْعَوْنُ اِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعَالَمِيْنَ ○ حَقِيْقٌ عَلٰى اَنْ لَّآ اَقُوْلَ عَلَى اللهِ اِلَّا الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاَرْسِلْ مَعِيَ بَنِيْٓ اِسْرَآئِيْلَ ، قَالَ اِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِاٰيَةٍ فَاْتِ بِهَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ ○ فَاَلْقٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِيْنٌ ○ وَنَزَعَ يَدَهٗ فَاِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِيْنَ ○

অর্থঃ অতঃপর আমি তাদের পরে হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালামকে পাঠালাম নিদর্শনাবলীসহ ফেরাউন ও তার সভাসদদের নিকট। তখন তারা সেই নিদর্শনাবলীর সাথে কুফরী করলো। সুতরাং লক্ষ্য করো, কী পরিণতি হয়েছে অনাচারীদের। মুসা ‘আলাইহিস সালাম বললেন, হে ফেরাউন, আমি বিশ্বজগতের পালনকর্তার পক্ষ থেকে একজন রাসূল। আল্লাহর পক্ষ থেকে যে সত্য এসেছে, তার ব্যতিক্রম কিছু না বলার ব্যাপারে আমি সুদৃঢ়। আমি তোমাদের নিকট প্রতিপালকের পক্ষ থেকে স্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসেছি। সুতরাং তুমি বনী ইসরাইলকে আমার সাথে পাঠিয়ে দাও। সে (ফেরাউন) বললো, যদি তুমি কোন নিদর্শন নিয়ে এসে থাকো, তবে তা উপস্থিত করো, যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাকো। তখন তিনি তার লাঠি নিক্ষেপ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তা জ্যান্ত এক অজগর হয়ে গেল। তিনি তার হাত বের করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তা দর্শকদের

চোখে ধবধবে উজ্জ্বল শুভ্রে পরিণত হলো। (সূরা আ'রাফ, আয়াত: ১০৩-১০৮)

আয়াতে “তাদের পরে” বলে হযরত নূহ, হুদ, সালেহ, লূত ও শু‘আইব ‘আলাইহিমুস সালামের পরে অথবা তাঁদের সম্প্রদায়ের পরে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালামের আগমন তাদের পরে হয়েছিল। আয়াতে যে বলা হয়েছে, “আমি মুসাকে আমার নিদর্শনসহ ফেরাউন ও তার জাতির প্রতি পাঠিয়েছি”, এখানে নিদর্শন দিয়ে আসমানী কিতাব তাওরাতও হতে পারে কিংবা হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালামের মুজিযাসমূহও হতে পারে।

মুসা ‘আলাইহিস সালামের পরিচয়

হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালামের পিতার নাম ইমরান। আর মাতার নাম ইউকাবাদ। তার পিতার বংশপরম্পরা নিম্নরূপ; ইমরান বিন কামেত বিন লাবি বিন ইয়াকুব ‘আলাইহিস সালাম।

হযরত হারুন ‘আলাইহিস সালাম, মুসা ‘আলাইহিস সালামের আপন বড় ভাই ছিলেন। সে যুগে ফেরাউন হতো মিসরের সম্রাটদের উপাধি। হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালামের সময়ে যে ফেরাউন ছিল তার নাম ‘কাবুস’ বলে উল্লেখ করা হয়।

কোন জ্যোতিষী ফেরাউনের নিকট ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল, ইসরাইল বংশে এমন একটি ছেলের জন্ম হবে, যার হাতে আপনার রাজ্যের পতন হবে। এজন্য উক্ত ফেরাউন বনী ইসরাইলের নবজাত পুত্রশিশুদের হত্যা করে ফেলতো। তবে যেহেতু মেয়েদের দিক থেকে এজাতীয় কোন আশঙ্কা ছিল

না, তাই তাদের হত্যা করতো না। দ্বিতীয়ত এতে তার নিজস্ব একটি মতলবও ছিল যে, সেই মেয়েদের দিয়ে পরিচারিকার কাজ করানো যাবে। এ সম্পর্কে কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

وَاِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُوْنَ اَبْنَاءَكُمْ
وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَاءَكُمْ وَفِيْ ذٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ ○

অর্থঃ (স্মরণ কর ঐ সময়ের কথা) যখন আমি তোমাদের মুক্তিদান করেছিলাম ফেরাউনের লোকদের কবল থেকে, যারা তোমাদের কঠিন শাস্তি দিতো। তারা তোমাদের পুত্রসন্তানদের জবাই করতো এবং তোমাদের মেয়েদের জীবিত রাখতো। বস্তুত এতে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে এক মহাপরীক্ষা ছিল। (সূরা বাকারা, আয়াত: ৪৯)

উপরোক্তভাবে ছেলেসন্তানদের নিধন করার কারণে একসময় দেশে পুরুষ লোকের সংখ্যা আশংকাজনক হারে হ্রাস পেল। তখন ফেরাউন নিয়ম করলো, এক বছরে জন্ম নেওয়া ছেলেদের জীবিত রাখলো এবং পরবর্তী বছরে জন্ম নেওয়া ছেলেদের হত্যা করলো।

এতে করে যে বছর ছেলেদের জীবিত রাখা হতো, সে বছরই হযরত মুসা সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জন্মদানের ক্ষমতা আল্লাহ তা‘আলার ছিল, কিন্তু নির্বোধ ফেরাউনের উৎপীড়নমূলক পরিকল্পনা সম্পূর্ণরূপে নস্যাৎ করা এবং তাকে বোকা বানানোর ইচ্ছায় ছেলেসন্তান হত্যার বছরেই আল্লাহ তা‘আলা হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালামকে তার মায়ের গর্ভ থেকে ভূমিষ্ট করালেন।

অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালামকে ফেরাউনের পুত্রসন্তান হত্যাকারীদের কবল থেকে বাঁচানোর জন্য মাকে ইলহামের মাধ্যমে এই নির্দেশ দিলেন যে, তাকে একটি সিন্দুকে রেখে দরিয়ায় ভাসিয়ে দাও এবং তার ধ্বংসের আশংকা করো না। আমি তাকে নিজ হেফাজতে রাখবো এবং পুনরায় তাকে তোমার কাছে ফিরিয়ে দিব। আর তাকে নবী বানাবো।

এব্যাপারে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ ○ أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ.

অর্থঃ স্মরণ করুন, যখন আমি আপনার মাতাকে ইলহামের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছিলাম, যা জানিয়ে দেওয়ার ছিল, তুমি শিশু মুসাকে সিন্দুকে রাখো, অতঃপর তাকে দরিয়ায় ভাসিয়ে দাও। পরে দরিয়া তাকে তীরে ঠেলে দিবে। এতে তাকে আমার শত্রু ও তার শত্রু উঠিয়ে নিবে। (সূরা ত্ব-হা, আয়াত: ৩৮-৩৯)

উল্লিখিত আয়াতে أَوْحَيْنَا শব্দটির মূলধাতু হচ্ছে وحي (ওহী) ।

এখানে এ শব্দটি তার আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ এর দিয়ে উদ্দেশ্য এমন গোপন কথা বলা, যা শুধু যাকে বলা হয় সে-ই জানে, অন্য কেউ জানে না। এই আভিধানিক অর্থের দিক দিয়ে ওহী কারো বিশেষ গুণ নয়। নবী-রাসূল, সাধারণ মানুষ, অন্যান্য সৃষ্টিজীব, এমনকি জন্তু-জানোয়ার পর্যন্ত এতে শামিল হতে পারে। যেমন, কুরআনে কারীমের অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে,

وَاَوۡحٰی رَبُّکَ اِلَی النَّحۡلِ...

অর্থঃ আপনার পালককর্তা মৌমাছিকে আদেশ দিলেন. . . । (সূরা নাহল, আয়াত: ৬৮)

উক্ত আয়াতে মৌমাছিকে ওহীর মাধ্যমে পথ চলার নির্দেশনা প্রদানের কথা এই শাব্দিক অর্থের দিক দিয়েই বলা হয়েছে।

কাজেই উল্লিখিত আয়াতের ভিত্তিতে হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালামের জননীর নবী অথবা রাসূল হওয়া সাব্যস্থ হয় না। যেমন, হযরত মারিয়াম ‘আলাইহিস সালামের কাছেও আল্লাহর বাণী পৌঁছেছিল, অথচ তিনি নবী কিংবা রাসূল ছিলেন না।

মুসা ‘আলাইহিস সালাম যেভাবে লালিত-পালিত হলেন

হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালামের মা খোদায়ী ফরমান অনুযায়ী নবজাতক মুসাকে একটি সিন্দুকে ভরে দরিয়ায় ভাসিয়ে দিলেন এবং সাথে সাথে তার কন্যা তথা হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালামের বড় বোনকে সিন্দুকের পেছনে পেছনে যেতে বললেন। আর তাকে এদিকে খুব খেয়াল রাখতে বললেন যে, আল্লাহ তা‘আলা তাকে তার হাতে সংরক্ষণ করার অঙ্গীকার কীভাবে পূরণ করেন। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

وَقَالَتۡ لِاُخۡتِهٖ قُصِّیۡهِ فَبَصُرَتۡ بِهٖ عَنۡ جُنُبٍ وَّهُمۡ لَا یَشۡعُرُوۡنَ

অর্থঃ তিনি (মুসা ‘আলাইহিস সালামের মা) মুসা ‘আলাইহিস সালামের বোনকে বললেন, তার পেছনে পেছনে যাও। তখন সে দূর থেকে তাদের অজ্ঞাতসারে তাকে দেখে যেতে লাগল। (সূরা কাসাস, আয়াত: ১১)

মায়ের আদেশ মোতাবেক হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালামের বোন নদীর তীর ধরে সিন্দুকের পিছনে পিছনে চলতে লাগলেন। সিন্দুক ভাসতে ভাসতে একসময় শাহীমহলের ঘাটে ভিড়লে ফেরাউনের পরিবারের এক মহিলা তা দেখে খাদেমের মাধ্যমে বাক্সটি উঠিয়ে রাজদরবারে নিয়ে গেল। কুরআনে কারীমের নিম্নোক্ত আয়াতে সে কথা এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে,

فَالۡتَقَطَهٗۤ اٰلُ فِرۡعَوۡنَ لِيَكُوۡنَ لَهُمۡ عَدُوًّا وَّحَزَنًا

অর্থঃ অতঃপর ফেরাউনের পরিবার হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালামকে কুড়িয়ে নিলো, যাতে তিনি তাদের শত্রু ও দুঃখের কারণ হয়ে যান। (সূরা কাসাস, আয়াত: ৮)

হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালামের বোন ব্যাপারটি অবলোকন করে খুব খুশি হলেন এবং পরবর্তী সময়ে কী ঘটে তা জানার জন্য খাদেমদের সাথে রাজদরবারে প্রবেশ করলেন।

ইতোমধ্যে ফেরাউনের পরিবারের লোকজন সিন্দুক খুলল। তখন দেখতে পেল, ভিতরে ফুটফুটে সুন্দর একটি শিশু আরামে শুয়ে শুয়ে আঙুল চুষছে। তখন ফেরাউনের কন্যা তাকে অন্দরমহলে নিয়ে গেল।

ফেরাউনের স্ত্রী এত সুন্দর শিশু দেখে খুশিতে বাগ বাগ হয়ে তাকে খুব আদর-যত্ন করতে লাগল। সেসময় রাজপ্রাসাদের জনৈক কর্মচারী বললো, একে তো দেখতে আমাদের চিরশত্রু ইসরাইলী বাচ্চা মনে হচ্ছে। সুতরাং একে হত্যা করে ফেলা জরুরী, যাতে সে আমাদের দুঃস্বপ্ন বাস্তবায়নকারী না হতে পারে। এ কথা শুনে ফেরাউনও তাকে হত্যা করার খেয়াল করলো।

ফেরাউনের স্ত্রী তখন স্বামীর এমন মতি-গতি বুঝতে পেরে বললো, এতো সুন্দর বাচ্চাটা হত্যা করবেন না। কি চমৎকার শিশু! সে আমার ও আপনার চক্ষু শীতলকারী হবে। অথবা আমরা তাকে নিজেদের ছেলেই বানিয়ে নিব। আশাকরি, সে আমাদের জন্য মঙ্গলজনক হবে। এ সম্পর্কে সূরা কাসাসে ইরশাদ রয়েছে,

وَقَالَتِ امْرَاَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِّيْ وَلَكَ لَا تَقْتُلُوْهُ عَسٰى اَنْ يَّنْفَعَنَا اَوْ نَتَّخِذَهٗ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ۝

অর্থঃ ফেরাউনের স্ত্রী বললো, এই শিশু আমার ও আপনার নয়নমণি! তাকে হত্যা করবেন না। আশাকরি, সে আমাদের উপকারে আসবে কিংবা তাকে আমরা পুত্র বানিয়ে নিতে পারি। প্রকৃতপক্ষে এর পরিণাম সম্পর্কে তারা বুঝতে পারেনি। (সূরা কাসাস, আয়াত: ৯)

পরিশেষে মুসা ‘আলাইহিস সালামকে না মেরে ফেরাউনের পরিবার তাকে নিজেদের ঘরেই রাখলো। আল্লাহর কুদরত কত বিস্ময়কর! বিশ্বপ্রতিপালকের কী অপূর্ব কারিশমা! নিজেদের অজ্ঞতার দরুন অজান্তে তারা আপন শত্রুর লালন-পালন ও দেখাশোনার দায়িত্বভার মাথায় নিলো।

এরপর প্রশ্ন উঠলো বাচ্চাকে দুধ পান করানোর জন্য ধাত্রী নিয়োগের ব্যাপার নিয়ে। কাকে এই দায়িত্বে নিয়োজত করা যায়? শাহীমহলের ধাত্রীদের ডেকে আনা হলো। কিন্তু আল্লাহ তা‘আলা হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালামের মাতার সাথে কৃত ওয়াদা পূরণার্থে অবুঝ শিশুর মধ্যে এমন স্বভাবের উদ্ভাবন ঘটালেন যে, সে কারো স্তনই মুখে নিচ্ছে না। শাহীমহলের ধাত্রীগণ পেরেশান হয়ে গেলেন। তারা অনেক

চেষ্টা করলেন, কিন্তু হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালাম তাদের কারো দুধ পান করলেন না। তখন শিশুটিকে দুধ পান করানো নিয়ে তারা সবাই চিন্তায় পড়ে গেল।

এই অবস্থা দেখে হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালামের বোন তাদের বললেন, যদি অনুমতি হয়, তা হলে আমি এমন একজন ধাত্রীর সন্ধান দিতে পারি, যিনি অত্যন্ত নেককার এবং এই শিশুর খেদমতের জন্য খুবই উপযোগী হবেন। ইচ্ছা করলে আমি তাকে সঙ্গে করে নিয়েও আসতে পারি। পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে এ কথা ব্যক্ত করা হয়েছে,

وَحَرَّمۡنَا عَلَيۡهِ الۡمَرَاضِعَ مِنۡ قَبۡلُ فَقَالَتۡ هَلۡ اَدُلُّكُمۡ عَلٰۤی اَهۡلِ بَيۡتٍ يَّكۡفُلُوۡنَهٗ لَكُمۡ وَهُمۡ لَهٗ نَاصِحُوۡنَ○

অর্থঃ আর আমি পূর্ব থেকেই হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালামের জন্য ধাত্রীদের স্তন্যপান নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলাম। সুতরাং মুসা ‘আলাইহিস সালামের বোন বললেন, আমি আপনাদের এমন এক পরিবারের কথা বলবো কি, যারা আপনাদের পক্ষে একে লালন-পালন করবেন এবং তারা তার হিতাকাঙ্ক্ষী হবেন? (সূরা কাসাস, আয়াত: ১২)

ফেরাউনের স্ত্রী এমন সৎকর্মপরায়ণ ধাত্রীর সন্ধান পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে তাকে উপস্থিত করার জন্য বললেন। হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালামের বোন আনন্দে আত্মহারা হয়ে মাকে আনার জন্য নিজ ঘরপানে রওয়ানা হলেন।

ওদিকে হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালামের মা ছেলের চিন্তায় খুব অস্থির ও কাতর হয়ে পড়েছিলেন। খোদায়ী ইলহাম পেয়ে নিজ সন্তানকে তো দরিয়ায় ভাসিয়ে দিয়ে এসেছেন,

কিন্তু মায়ের মমতা তাকে পেরেশান করে তুলেছে। এমনকি অস্থির হয়ে একপর্যায়ে তিনি নিজ বাচ্চাকে সিন্দুকে পুরে নদীতে ভাসিয়ে দেওয়ার গোপন তথ্য ফাঁস করে দিতে অহংকারী হলেন, যাতে তার খোঁজ পেতে পারেন।

এমন কঠিন পরিস্থিতিতে আল্লাহ তা‘আলা তার উপর স্বীয় করুণা ও রহমতের বারিধারা বর্ষণ করলেন এবং তার অন্তরে সবরের শক্তি সৃষ্টি করে তাকে প্রশান্তি দান করলেন। এক আয়াতে এ কথা বিবৃত হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেছেন,

وَاَصۡبَحَ فُؤَادُ اُمِّ مُوۡسٰى فَارِغًا اِنۡ كَادَتۡ لَتُبۡدِىۡ بِهٖ لَوۡلَا اَنۡ رَّبَطۡنَا عَلٰى قَلۡبِهَا لِتَكُوۡنَ مِنَ الۡمُؤۡمِنِيۡنَ ○

অর্থঃ সকালে মুসার জননীর অন্তর অস্থির হয়ে পড়লো। যদি আমি তার হৃদয়কে সুদৃঢ় করে না দিতাম, তবে সে মুসার ঘটনাজনিত অস্থিরতার কথা প্রকাশ করেই দিত। আমি তার অন্তর এজন্য মজবুত করে দিলাম, যেন সে বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত থাকে। (সূরা কাসাস, আয়াত: ১০)

তখন হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালামের জননী অপেক্ষমাণ থাকেন যে, স্বীয় কন্যা কী সংবাদ নিয়ে আসে। এমনি মুহূর্তে তার মেয়ে সংবাদ নিয়ে এসে বললেন, ভাইটি ফেরাউনের ঘরে আশ্রয় পেয়েছে। কিন্তু সে কোন ধাত্রীর দুধ পান করছে না। তখন আমি বললাম, ইসরাইল গোত্রে অত্যন্ত ভদ্র ও নেককার একজন মহিলা আছেন, যিনি এই শিশুকে নিজ সন্তানের মতো লালন-পালন করতে পারবেন। ফেরাউনের স্ত্রী এ কথা শুনে আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, এখনই তাকে নিয়ে এসো।

হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালামের বোন আরো বললেন, এটা আমাদের উপর মহান রবের অনেক বড় ইহসান। সুতরাং আপনি এখন চলুন এবং সন্তান বুকে নিয়ে চক্ষু শীতল করুন, আর মহান রাব্বুল ‘আলামীনের শোকর আদায় করুন। তিনি তার অঙ্গীকার পূরণ করেছেন।

এ সম্পর্কে কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

فَرَدَدْنَاهُ اِلٰى اُمِّهٖ كَیْ تَقَرَّ عَیْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا
یَعْلَمُوْنَ○

অর্থঃ অবশেষে আমি তাকে তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিলাম, যাতে তার চক্ষু জুড়ায় এবং তিনি চিন্তান্বিত না থাকেন। আর যাতে তিনি জানেন যে, আল্লাহর ওয়াদা অবশ্যই সত্য। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না। (সূরা কাসাস, আয়াত: ১৩)

এভাবে আল্লাহ তা‘আলা হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালামকে তার জননীর কাছে ফিরিয়ে দেন। তখন তার জননী নিজ হাতে তাকে লালন- পালন করতে থাকেন।

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো, হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালাম যদি সাধারণ শিশুদের ন্যায় কোন ধাত্রীর দুধ গ্রহণ করতেন, তবে তার লালন- পালন শত্রু ফেরাউনের ঘরে সুখে- স্বাচ্ছন্দ্যে হতো। কিন্তু তার মাতা তার বিরহে ব্যাকুল থাকতেন এবং হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালামও কোন কাফের মহিলার দুধ পেতেন। আল্লাহ তা‘আলার কী কুদরত, তিনি তার নবীকে কাফের মহিলার দুধ থেকেও বাঁচিয়ে নিলেন এবং অপরদিকে তার মাকেও বিরহের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিলেন। আর সেই মুক্তিও এমনভাবে দিলেন,

ফেরাউনের পরিবার তার কাছে ঋণী হয়ে রইলো এবং এত উপঢৌকন ও উপহার দিল যে, সেগুলোর স্তূপ হয়ে গেলো।

আরো সুবিধার বিষয় হলো, নিজেরই প্রাণপ্রিয় সন্তানকে দুধ পান করানোর বিনীময়ে মুসা ‘আলাইহিস সালামের জননী ফেরাউনের রাজদরবার থেকে ভাতাও পেতে লাগলেন এবং ফেরাউনের ঘরে সাধারণ কর্মচারীদের ন্যায় তাকে থাকতেও হলো না। নিজ ঘরেই তাকে লালন- পালন করতে লাগলেন।

অতঃপর হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালাম যখন একটু বড় হলেন এবং তার স্তন্যপান ছাড়ার বয়স হলো, তখন মুসা ‘আলাইহিস সালামকে তার মা ফেরাউনের মেয়ের কাছে বুঝিয়ে দিয়ে এলেন। এরপর থেকে তিনি ফেরাউনের ঘরেই বড় হতে লাগলেন।

মুসা ‘আলাইহিস সালামকে মিসর ছাড়তে হলো

অতঃপর ক্রমান্বয়ে তিনি যখন বড় হয়ে প্রাপ্তবয়স্ক হলেন, তখন এ ব্যাপারটি জানতে পারলেন, তিনি মূলত ইসরাইল বংশীয়; ফেরাউনের বংশ বা মিসরীদের সাথে তার কোনরকম আত্মীয়তার সম্পর্ক নেই। সেই থেকে স্ববংশীয় ইসরাইলী লোকদের প্রতি তিনি হৃদয়ের টান অনুভব করতে লাগলেন।

এর পরে একদিনের ঘটনা। হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালাম শহরের লোকালয় থেকে একপ্রান্তে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি এক ইসরাইলীকে ফেরাউনী বা কিবতী বংশের কাফেরের সাথে লড়াইরত দেখে কিবতীকে ঘুষি মারলেন। ঘটনাক্রমে কিবতীটা সাথে সাথে প্রাণ হারালো।

পরে অবশ্য মুসা ‘আলাইহিস সালাম এজন্য আফসোস করলেন এবং এই কাজটাকে “শয়তানের কাজ” বলে অভিহিত করেন। সেজন্য তিনি এ ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করেন। তখন দয়াময় আল্লাহ তা‘আলা তাকে ক্ষমা করে দেন। কুরআন মজীদে এ সম্পর্কে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ اَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِن
شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ
فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ اِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ، قَالَ رَبِّ اِنِّي ظَلَمْتُ
نَفْسِيْ فَاغْفِرْ لِيْ فَغَفَرَ لَهُ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيمُ

অর্থঃ হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালাম এমন সময় শহরে প্রবেশ করলেন, যখন তার অধিবাসীরা ছিল উদাসীন। তখন তিনি সেখানে দুই ব্যক্তিকে লড়াইরত দেখলেন। এদের একজন ছিল তার গোত্রের এবং অন্যজন তার শত্রু পক্ষের। তখন যে ব্যক্তি তার গোত্রের ছিল, সে তার শত্রু পক্ষের লোকটির মোকাবেলায় তার সাহায্যপ্রার্থনা করলো। তখন মুসা শত্রু পক্ষের লোকটিকে ঘুষি মারলেন। ফলে সে মারা গেল। মুসা বললেন, এটা তো শয়তানের কাজ। নিশ্চয় শয়তান প্রকাশ্য শত্রু ও বিভ্রান্তকারী। তিনি বললেন, হে আমার রব, আমি নিজের উপর জুলুম করে ফেলেছি। অতএব, আমাকে ক্ষমা করুন। তখন আল্লাহ তা‘আলা তাকে ক্ষমা করলেন। নিশ্চয় তিনি পরম ক্ষমাশীল ও দয়ালু। (সূরা কাসাস, আয়াত: ১৫-১৬)

পরের দিন তিনি সেই ইসরাইলীকে আরেকজনের সাথে ঝগড়া করতে দেখলেন এবং সে তখনও মুসা ‘আলাইহিস সালামের নিকট সাহায্যপ্রার্থনা করলো। তিনি তাকে তার ঝগড়াটে স্বভাবের হওয়ার কারণে তিরস্কার করলেন। অতঃপর তাদের বিচার করে শত্রু পক্ষকে প্রতিরোধ করতে যাবেন, এমন সময় সে ভুল বুঝলো যে, তিনি তাকে আঘাত করবেন। তখন সে বাঁচার জন্য গতকালের কিবতীকে মারার ঘটনা ফাঁস করে দিলো।

ফলে মুসা ‘আলাইহিস সালামের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হলো। তখন তিনি নিরাপত্তার জন্য মিসর থেকে হিজরত করে মাদইয়ান চলে যান। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ ○ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ○

অর্থঃ এক ব্যক্তি শহরের দূরপ্রান্ত থেকে ছুটে এসে বললো, হে মুসা, রাজ্যের পরিষদবর্গ আপনার সম্বন্ধে পরামর্শ করছে, তারা আপনাকে হত্যা করে ফেলবে। সুতরাং আপনি এখান থেকে চলে যান। নিঃসন্দেহে আমি আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী। তখন তিনি সেখান থেকে ভীত অবস্থায় চারিদিক দেখতে দেখতে বের হয়ে পড়লেন। তিনি বললেন, হে আমার রব, আমাকে জালিম সম্প্রদায়ের কবল থেকে রক্ষা করুন। (সূরা কাসাস, আয়াত: ২০-২১)

মুসা ‘আলাইহিস সালাম মাদইয়ান শহরের উপকণ্ঠে এসে পৌঁছে, সেখানে দেখতে পেলেন, দু’জন কিশোরী তাদের অক্ষমতার দরুন নিজেদের ছাগলকে পানি পান করাতে পারছে না। তারা ছিল একদম অচেনা। আর হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালাম একজন মুসাফির ছিলেন। কিন্তু অক্ষমদের সেবা করা ভদ্রতা ছাড়াও আল্লাহ তা‘আলার কাছে পছন্দনীয় বিষয় ছিল। তাই তিনি তাদের জন্য কষ্ট স্বীকার করে তাদের ছাগলকে পানি পান করিয়ে দিলেন।

এই কাজের সাওয়াব ও বিনিময় আল্লাহ তা‘আলার কাছে বিরাট। উপরন্তু দুনিয়াতে তার এ কাজটিই প্রবাসজীবনের অসহায়ত্ব ও সম্বলহীনতার প্রতিকাররূপে আল্লাহ তা‘আলা সাব্যস্ত করে দিলেন। আর পরবর্তী সময়ে নিজের শান অনুযায়ী জীবন গঠন করার সুযোগ তিনি এর মাধ্যমেই লাভ করেন।

তা এভাবে হলো, সেই কিশোরীদ্বয়ের পিতা ছিলেন হযরত শু‘আইব ‘আলাইহিস সালাম। তিনি কন্যাদের কাছে ঘটনা শুনে মুসা ‘আলাইহিস সালামকে বিনিময় দেওয়ার জন্য ডেকে পাঠালেন এবং তার বিস্তারিত কাহিনী শুনে তাকে সান্তনা দিলেন। পরে তার কাছে তার এক কন্যাকে বিবাহ দিয়ে তাকে জামাতা বানিয়ে নিলেন। আর তার জন্য সেখানে কাজের ব্যবস্থা করেন।

আল্লাহ তা‘আলার মর্জি যে, মুসা ‘আলাইহিস সালাম যৌবনে পদার্পণ করার পর তার মাতাকে তার বিয়ে-শাদির ব্যাপারে যে দায়িত্ব পালন করতে হতো, আল্লাহ তা‘আলা

প্রবাসজীবনে তা একজন নবীর হাতে সম্পন্ন করে দিলেন। কুরআন মজীদে এই মর্মে ইরশাদ হয়েছে,

وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدۡيَنَ وَجَدَ عَلَيۡهِ اُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسۡقُوۡنَ وَوَجَدَ مِنۡ دُوۡنِهِمُ امۡرَاَتَيۡنِ تَذُوۡدٰنِ قَالَ مَا خَطۡبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسۡقِيۡ حَتّٰى يُصۡدِرَ الرِّعَآءُ وَاَبُوۡنَا شَيۡخٌ كَبِيۡرٌ ○ فَسَقٰى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلّٰۤى اِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ اِنِّيۡ لِمَاۤ اَنۡزَلۡتَ اِلَيَّ مِنۡ خَيۡرٍ فَقِيۡرٌ ○

অর্থঃ যখন তিনি (মুসা ‘আলাইহিস সালাম) মাদইয়ানের পানির কূপের কাছে পৌঁছুলেন, তখন তিনি কূপের কাছে একদল লোককে পেলেন, তারা নিজ নিজ জন্তুকে পানি পান করানোর কাজে রত। আর তাদের পেছনে দু’জন কিশোরীকে দেখলেন, তারা তাদের জন্তুদের আগলে রেখেছে। তিনি বললেন, তোমাদের কী ব্যাপার? তারা বললো, আমরা আমাদের জন্তুদের পানি পান করাতে পারি না, যে পর্যন্ত রাখালেরা তাদের পশুগুলো নিয়ে সরে না যায়। আর আমাদের পিতা খুবই বৃদ্ধ। (তাই তিনি আসতে পারেন না।) তখন মুসা ‘আলাইহিস সালাম তাদের জন্তুদের পানি পান করালেন। অতঃপর তিনি ছায়ার দিকে সরে গেলেন এবং বললেন, হে আমার পালনকর্তা, আপনি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ নাযিল করেছেন, আমি তার প্রতি মুখাপেক্ষী। (সূরা কাসাস, আয়াত: ২৩-২৪)

তখন থেকে হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালাম আট বছর মতান্তর দশ বছর হযরত শু‘আইব ‘আলাইহিস সালামের কাছে মাদইয়ান শহরে অবস্থান করেন। অতঃপর নিজ দেশে যাওয়ার মনস্থ করে সেখান থেকে মিসরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলেন। তখন পথিমধ্যে রিসালাত ও নবুওয়্যাতের মহান দায়িত্ব লাভ করলেন।

দীনের দাওয়াত নিয়ে ফেরাউনের দরবারে মুসা ‘আলাইহিস সালাম

নবুওয়্যাত প্রাপ্তির পর মুসা ‘আলাইহিস সালাম ও তার বড় ভাই হযরত হারুন ‘আলাইহিস সালাম, আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীনের পক্ষ থেকে মিসর সম্রাট ফেরাউনকে ঈমান ও দীনের দাওয়াত দেওয়ার জন্য আদিষ্ট হন।

এই মর্মে আল্লাহ তা‘আলা নিম্নোক্ত আয়াতের মাধ্যমে তাদের দাওয়াতের মূলনীতি শিখিয়ে দিলেন,

اِذْهَبَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى ○ فَقُوْلَا لَهٗ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهٗ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشٰى ○

অর্থঃ আপনারা উভয়ে ফেরাউনের কাছে যান। সে খুব অহংকারী হয়ে গিয়েছে। অতঃপর আপনারা তাকে নম্র কথা বলুন। হয়তো সে চিন্তা-ভাবনা করবে অথবা ভীত হবে। (সূরা ত্ব-হা, আয়াত: ৪৪)

এখানে বলা হয়েছে, প্রতিপক্ষ যতই অবাধ্য এবং ভ্রান্ত বিশ্বাস ও গলদ চিন্তাধারার অধিকারী হোক না কেন, তার সাথেও সংস্কার ও পথপ্রদর্শনের কর্তব্য পালনকারীদের হিতাকাঙ্ক্ষীর ভঙ্গিতে নম্রভাবে বিনয়ের সাথে কথাবার্তা বলতে হবে। এরই ফলে সে কিছু চিন্তাভাবনা করতে পারে এবং তার অন্তরে আল্লাহ তা‘আলার ভয় সৃষ্টি হতে পারে।

তখন হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালাম হারুন ‘আলাইহিস সালামকে নিয়ে আল্লাহ তা‘আলার আদেশ মোতাবেক ফেরাউনের কাছে গেলেন এবং তাকে ঈমানের দাওয়াত দিলেন আর বনী ইসরাইল সম্প্রদায়কে হিদায়াত করে দীনের পথে আনার উদ্দেশ্যে তাদের অন্যায় দাসত্ব থেকে মুক্তি

দিয়ে তার সাথে ফিরিয়ে দেওয়ার আহ্বান জানালেন। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

وَقَالَ مُوْسٰى يٰفِرْعَوْنُ اِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○ حَقِيْقٌ عَلٰۤى اَنْ لَّاۤ اَقُوْلَ عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاَرْسِلْ مَعِيَ بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ ○

অর্থঃ হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালাম বললেন, হে ফেরাউন, আমি বিশ্বপালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত রাসূল। আল্লাহ তা‘আলার তরফ থেকে যে সত্য এসেছে, তার ব্যতিক্রম কিছু না বলার ব্যাপারে আমি সুদৃঢ়। আমি আপনার নিকট প্রতিপালকের স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে এসেছি। সুতরাং আপনি বনী ইসরাইলদের আমার সাথে পাঠিয়ে দিন। (সূরা আ‘রাফ, আয়াত: ১০৪-১০৫)

ফেরাউন হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালামের দাওয়াতের জবাবে বললো,

قَالَ فَمَنْ رَّبُّكُمَا يٰمُوْسٰى

অর্থঃ সে বললো, তা হলে কে তোমাদের রব হে মুসা?

এর উত্তরে হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালাম বললেন,

قَالَ رَبُّنَا الَّذِيْۤ اَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى

অর্থঃ তিনি বললেন, আমাদের রব সেই মহান সত্তা, যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার উপযুক্ত গঠন দান করেছেন। অতঃপর তাকে পথপ্রদর্শন করেছেন। (সূরা ত্ব-হা, আয়াত: ৪৯-৫০)

এই আয়াত দিয়ে বুঝা যায়, মুসা ‘আলাইহিস সালাম ফেরাউনকে সর্বপ্রথম আল্লাহ তা‘আলার ঐ মহান গুণের কথা বলেছেন, যা সমগ্র সৃষ্টজগতে পরিব্যাপ্ত এবং কেউ

এই গুণের কাজটি নিজে অথবা অন্য কোনো মানব করেছে বলে দাবি করতে পারে না।

ফলে ফেরাউন এই কথার কোন জবাব দিতে পারলো না। সে লা- জবাব হয়ে আবোল- তাবোল প্রশ্ন তুলে প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেল এবং শেষে হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালামকে এমন একটি প্রশ্ন করলো, যার সত্যিকার জবাব সাধারণ মানুষ শুনতে পেলে, মুসা ‘আলাইহিস সালামের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলবে এবং তাদের শ্রদ্ধা ভক্তিও তাঁর প্রতি নষ্ট হয়ে যাবে। প্রশ্নটি হলো,

قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُوْنِ الْاُوْلٰى

অর্থঃ সে (ফেরাউন) বললো, তা হলে পূর্ববর্তী কালের লোকদের অবস্থা কি? (সূরা ত্ব-হা, আয়াত: ৫১)

অর্থাৎ অতীত যুগে যেসব ব্যক্তি ও জাতি প্রতিমাপূজা করতো, তোমার মতে তারা কিরূপ? তাদের শেষ পরিণাম কী হয়েছে?

ফেরাউনের উদ্দেশ্য ছিল, এর উত্তরে হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালাম অবশ্যই বলবেন, তারা সবাই গোমরাহ ও জাহান্নামী। তখন ফেরাউন একথা বলার সুযোগ পাবে, তুমি তো গোটা বিশ্বকেই বেওকুফ, গোমরাহ ও জাহান্নামী মনে করো। এ কথা শুনে জনসাধারণের, মুসা ‘আলাইহিস সালামের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি নষ্ট হয়ে যাবে এবং কুধারণা পোষণ করবে। ফলে ফেরাউনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়ে যাবে।

কিন্তু মুসা ‘আলাইহিস সালাম বিচক্ষনতার সাথে এই প্রশ্নের এমন সুন্দর জবাব দিলেন, যার ফলে ফেরাউনের

TOP

পরিকল্পনা নস্যাৎ হয়ে গেল। নিচের এই আয়াতে হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালামের সেই জবাবের কথা ব্যক্ত করা হয়েছে,

قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّیْ فِیْ كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّیْ وَلَا يَنْسٰى

অর্থঃ মুসা ‘আলাইহিস সালাম বললেন, তাদের খবর আমার পালনকর্তার কাছে আমলনামায় লিপিবদ্ধ রয়েছে। আমার রব বিভ্রান্ত হন না এবং বিস্মৃত হন না। (সূরা ত্ব-হা, আয়াত: ৫২)

মুসা ‘আলাইহিস সালামের মুজিযা

ফেরাউন উল্লিখিত পন্থায় তার উদ্দেশ্য সাধন করতে ব্যর্থ হয়ে হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালামকে প্রমাণ পেশ করার দাবি জানিয়ে বললো,

قَالَ اِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِاٰيَةٍ فَاْتِ بِهَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ○

অর্থঃ বাস্তবিকই যদি তুমি কোন প্রমাণ নিয়ে এসে থাকো তবে তা উপস্থাপন করো, যদি তুমি সত্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকো। (সূরা আ‘রাফ, আয়াত: ১০৬)

তখন হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালাম তার দাবি মেনে নিয়ে স্বীয় লাঠিখানা মাটিতে ফেলে দিলেন। আর অমনি তা এক বিরাট অজগর সাপে পরিণত হয়ে গেল। কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে,

فَاَلْقٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِیَ ثُعْبَانٌ مُّبِيْنٌ ○

অর্থঃ তখন তিনি তার লাঠিখানা নিক্ষেপ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তা জলজ্যান্ত এক অজগর হয়ে গেল। (সূরা আ‘রাফ, আয়াত: ১০৭)

অতঃপর হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালাম ফেরাউনকে দ্বিতীয় মুজিযা দেখানোর উদ্দেশ্যে নিজের হাতকে বগল থেকে বের করলেন। অমনি তা শুভ্র উজ্জ্বল রূপ ধারণ করলো। নিচের আয়াতে তার এই মুজিযার কথা ব্যক্ত করা হয়েছে,

وَنَزَعَ يَدَهٗ فَاِذَا هِىَ بَيۡضَآءُ لِلنّٰظِرِيۡنَ ○

অর্থঃ আর তিনি তার হাত বের করলেন, সঙ্গে সঙ্গে তা দর্শকদের চোখে ধবধবে উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হলো। (সূরা আ‘রাফ, আয়াত: ১০৮)

মুসা ‘আলাইহিস সালামের নবুওয়্যাতের পক্ষে ফেরাউনের প্রমাণ দাবির পরিপ্রেক্ষিতে মুসা ‘আলাইহিস সালাম আল্লাহ তা‘আলার হুকুমে দুটি মুজিযা দেখান। প্রথম মুজিযার বর্ণনা এই আয়াতে রয়েছে,

فَاَلۡقٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِىَ ثُعۡبَانٌ مُّبِيۡنٌ ○

অর্থঃ তখন তিনি নিজের লাঠিখানা নিক্ষেপ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তা জ্যান্ত এক অজগর হয়ে গেল। (সূরা আ‘রাফ, আয়াত: ১০৭)

ثُعۡبَانٌ বলা হয় বিরাটকায় অজগরকে। সেই সঙ্গে গুণবাচক শব্দ مُّبِيۡنٌ উল্লেখ করে বলা হয়েছে, সেই লাঠির সাপ হয়ে যাওয়াটা এমন কোন গোপন ঘটনা ছিল না, যা অন্ধকারে কিংবা পর্দার আড়ালে ঘটেছিল বা যা কেউ কেউ দেখেছিল আর কেউ কেউ দেখেনি। যেমনটা সাধারণত যাদু বা ভেল্কিবাজির বেলায় হয়ে থাকে। বরং সেই ঘটনা এমন প্রকাশ্য স্থানে সাধারণ মানুষের সামনে ঘটেছিল, যা সকলের চোখের সামনে দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

এটাই প্রমাণ যে, সেটা কোন চোখের ধাঁধা নয়, বরং বাস্তবভাবে সংঘটিত ঘটনা ছিল।

কোন কোন ঐতিহাসিকের উদ্ধৃতিতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত আছে, সেই অজগর ফেরাউনের প্রতি যখন হা করে মুখ বাড়ালো, তখন সে সিংহাসন থেকে লাফিয়ে পড়ে হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালামের শরণাপন্ন হলো। আর দরবারের বহুলোক ভয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হলো। (তাফসীরে কাবীর)

লাঠি সাপ হয়ে যাওয়া প্রকৃতিবিরুদ্ধ হওয়ায়, এটা যে বেশ বিস্ময়কর ব্যাপার, তাতে কোন সন্দেহ নেই। আর মুজিযা বা কারামতের উদ্দেশ্যও থাকে তা-ই। যে কাজ সাধারণ মানুষ করতে পারে না, তা নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে আল্লাহর পক্ষ থেকে করে দেওয়া হয়, যাতে মানুষ বুঝতে পারে, তাদের সঙ্গে খোদায়ী শক্তি বিদ্যমান আছে।

তবে হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালামের লাঠি সাপ হয়ে যাওয়া বিস্ময়কর হলেও অস্বীকার করার মতো কোন বিষয় ছিল না। কেননা, এটা প্রত্যক্ষকারীদের দিয়ে চাক্ষুষভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

এর আগে উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালাম আল্লাহ তা‘আলার ইচ্ছায় দ্বিতীয় যে মুজিযা পেশ করেন, তা হচ্ছে,

وَنَزَعَ يَدَهٗ فَاِذَا هِيَ بَيۡضَآءُ لِلنّٰظِرِيۡنَ ○

অর্থঃ আর তিনি নিজের হাত বের করলেন, সঙ্গে সঙ্গে তা দর্শকদের চোখে ধবধবে উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হলো। (সূরা আ‘রাফ, আয়াত: ১০৮)

نَزَعَ এর মূলধাতু نَزْعٌ - এর অর্থ হলো একটি বস্তুকে অপর একটি বস্তুর ভেতর থেকে কিছুটা বলপ্রয়োগের মাধ্যমে বের করা। সুতরাং এখানে উদ্দেশ্য হলো মুসা ‘আলাইহিস সালাম নিজের হাতখানা টেনে বের করলেন।

মুসা ‘আলাইহিস সালাম হাতখানা কিসের ভেতর থেকে বের করলেন, তা এখানে উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু কুরআনে কারীমের অন্যত্র বিষয়টি পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে,

وَاضْمُمْ يَدَكَ اِلٰى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوْٓءٍ اٰيَةً اُخْرٰى ○

অর্থঃ আর আপনি আপনার হাত বগলে রাখুন। (এরপর তা বের করলে) তা বের হয়ে আসবে নির্মল উজ্জ্বল অবস্থায়। এটা অন্য এক নিদর্শনরূপে প্রদান করা হলো। (সূরা ত্ব-হা, আয়াত: ২২)

বস্তুত মুসা ‘আলাইহিস সালাম উক্ত হাত তার বগলের নিচে দাবিয়ে সেখান থেকে বের করে আনলে এই মুজিযা প্রকাশ পেত অর্থাৎ তখন তা দর্শকদের সামনে সূর্যের মতো ঝলমল করতে থাকতো। (তাফসীরে মাযহারী)

বলাবাহুল্য, ফেরাউনের দাবিতে হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালাম দু’টি মুজিযা প্রদর্শন করেছিলেন। একটি হলো লাঠির সাপ হয়ে যাওয়া। অপরটি হলো নিজের হাত মোবারক বগলের নিচে দাবিয়ে বের করে আনলে তা প্রদীপ্ত ও উজ্জ্বল হয়ে উঠা। প্রথম মুজিযাটি ছিল বিরোধীদের

ভীতিপ্রদর্শন করার জন্য আর দ্বিতীয়টি তাদের আকৃষ্ট করে কাছে আনার উদ্দেশ্যে। এতে এই ইংগিত ছিল যে, হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালামের শিক্ষায় একটি হিদায়াতের জ্যোতি রয়েছে। তাই তার অনুসরণ-অনুকরণই কল্যাণ ও কামিয়াবীর একমাত্র চাবিকাঠি।

মুসা ‘আলাইহিস সালামের মুজিযা ও ফেরাউনের যাদু

হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালামের এই দুটি মুজিযা দেখার পরে ফেরাউনের সাঙ্গপাঙ্গরা যে মন্তব্য করলো, নিচের আয়াতে তার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

قَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اِنَّ هٰذَا لَسَاحِرٌ عَلِيْمٌ ○

অর্থঃ ফেরাউনের কওমের সরদাররা বলতে লাগলো, নিশ্চয় এ একজন বিজ্ঞ যাদুকর। (সূরা আ‘রাফ, আয়াত: ১০৯)

তারা মুজিযার বিস্ময়কর ঘটনা দেখার পর একে যাদু বলে আখ্যায়িত করলো। কিন্তু তারাও এখানে ساحر শব্দের সাথে عليم শব্দটি যোগ করে একথা স্বীকার করলো, হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালামের মুজিযা সম্পর্কে তাদের মনে এই অনুভূতি জন্মেছে যে, এ কাজটি সাধারণ যাদুকরদের কাজ থেকে স্বতন্ত্র ও ভিন্ন প্রকৃতির। সেজন্যই তারা বললো, তিনি বড়ই বিজ্ঞ যাদুকর। সাধারণ যাদুকররা এ ধরনের কাজ দেখাতে পারে না।

হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালাম থেকে উল্লিখিত মুজিযা প্রকাশ পাওয়ার পরে ফেরাউনের কওমের সরদাররা আরো বলতে লাগলো, মুসা যেহেতু একজন বিজ্ঞ যাদুকর, তাই সে তোমাদের দেশান্তর করে দেশ দখল করে নিবে। পবিত্র

কুরআনের এক আয়াতে তাদের উক্ত কথা ব্যক্ত করা হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

يُرِيْدُ اَنْ يُّخْرِجَكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَاْمُرُوْنَ ○

অর্থঃ (তারা বললো,) সে তোমাদের দেশ থেকে তোমাদের বের করে দিতে চায়। এ ব্যাপারে তোমাদের কী মত? (সূরা আ‘রাফ, আয়াত: ১১০)

ফেরাউনের সম্প্রদায় একথা শুনে উত্তর দিলো,

اَرْجِهْ وَاَخَاهُ وَاَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِيْنَ، يَاْتُوْكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيْمٍ ○

অর্থঃ আপনি তাকে ও তার ভাইকে কিঞ্চিৎ অবকাশ দিন এবং শহরে-বন্দরে লোক প্রেরণ করুন যাদুকরদের সমবেত করার জন্য। তারা আপনার নিকট বিজ্ঞ যাদুকরদের সমাবেশ ঘটাবে। (সূরা আ‘রাফ, আয়াত: ১১১)

অর্থাৎ, সম্প্রদায়ের লোকেরা পরামর্শ দিলো, তিনি যদি যাদুকর হয়ে থাকেন এবং যাদু দিয়েই আমাদের দেশ দখল করতে চান, তবে তার মোকাবেলা করা আমাদের জন্য কোন কঠিন ব্যাপার নয়। কারণ, আমাদের দেশে বড় বড় অভিজ্ঞ যাদুকর রয়েছেন, যারা তাকে যাদুর মাধ্যমে পরাভূত করে দিবেন। কাজেই আপনি কিছু সৈন্য-সামন্ত দেশের বিভিন্ন স্থানে পাঠিয়ে দিন, তারা গোটা শহর থেকে ভালো যাদুকরদের খুঁজে ডেকে নিয়ে আসবে।

তখন যাদু-মন্ত্রের ব্যাপক প্রচলন ছিল এবং সাধারণ লোকদের উপর যাদুকরদের প্রচুর প্রভাব ছিল। আর হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালামকেও লাঠি এবং উজ্জ্বল হাতের মুজিযা এজন্যই দেওয়া হয়েছিল, যাতে তৎকালীন

যাদুকরদের সাথে তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় এবং মুজিযার মোকাবেলায় যাদুর পরাজয় সবাই দেখে নিতে পারে। আর আল্লাহ তা'আলার নিয়মও তাই যে, প্রত্যেক যুগের নবী-রাসূলকে তিনি সে-যুগের জনগণের সাধারণ প্রবণতা অনুযায়ী মুজিযা দান করেছেন। হযরত ঈসা 'আলাইহিস সালামের যুগে গ্রিকবিজ্ঞান ও গ্রিকচিকিৎসা বিজ্ঞান যেহেতু উৎকর্ষের স্বর্ণশিখরে পৌঁছে ছিল, তাই তাকে মুজিযা দেওয়া হয়েছিল জন্মান্ধকে দৃষ্টিসম্পন্ন করে দেওয়া এবং কুষ্ঠরোগীকে সুস্থ করে তোলা। তেমনি মুসা 'আলাইহিস সালামকে সেই যুগেরই অনুকূল মুজিযা দিয়েছিলেন।

ফেরাউন তার পরিষদবর্গের পরামর্শ অনুযায়ী হযরত মুসা 'আলাইহিস সালামের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতার উদ্দেশ্যে সারাদেশ থেকে বিজ্ঞ যাদুকরদের সমবেত করলো। তারা যে সমস্ত যাদুকরকে একত্র করেছিল, তাদের সংখ্যার ব্যাপারে বিভিন্ন ঐতিহাসিক-বর্ণনা রয়েছে। তাদের সংখ্যা বর্ণনাভেদে নয়শ থেকে শুরু করে তিন লক্ষ পর্যন্ত বর্ণিত রয়েছে। তাদের সাথে লাঠি ও দড়ির এক বিরাট স্তূপও ছিল, যা তিনশ উটের পিঠে বোঝাই করে আনা হয়েছিল। (আল-জামি'লিআহকামিল কুরআন)

ফেরাউনের যাদুকররা প্রথমে এসেই দরকষাকষি করতে শুরু করলো, আমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলে এবং তাতে জয়ী হলে, আমরা কী পাবো? এমনটি করার কারণ হচ্ছে, যারা দুনিয়াপন্থী, পার্থিব লাভই হলো তাদের মুখ্য। কাজেই যেকোনো কাজ করার আগে তাদের সামনে থাকে বিনিময় কিংবা লাভের প্রশ্ন। কুরআনে কারীমের নিম্নোক্ত আয়াতে

তাদের এই দরকষাকষির বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوْا اِنَّ لَنَا لَاَجْرًا اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِيْنَ ○

অর্থঃ যাদুকররা ফেরাউনের কাছে এসে উপস্থিত হলো। তারা বললো, আমাদের জন্য কোন পারিশ্রমিক আছে কি, যদি আমরা জয় লাভ করি? (সূরা আ‘রাফ, আয়াত: ১১৩)

পক্ষান্তরে নবী-রাসূল এবং যারা তাদের নায়েব তথা হক্কানী আলেম, তারা প্রতিপদক্ষেপে ঘোষণা করেন,

وَمَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ، اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ○

অর্থঃ আমরা যে সত্যের বাণী আপনাদের নিকট পৌঁছে দিই, আপনাদের কাছে তার কোন প্রতিদান আশা করি না। বরং আমাদের প্রতিদানের বিষয় শুধু আল্লাহ তা‘আলার উপরই ন্যস্ত রয়েছে। (সূরা শুআরা, আয়াত: ১৪৫)

যাদুকরদের পারিশ্রমিক দাবির জবাবে ফেরাউন তাদের বললো, তোমরা পারিশ্রমিক চাচ্ছো? আমি তোমাদের পারিশ্রমিক তো দিবই, উপরন্তু তোমাদের শাহী-দরবারের ঘনিষ্ঠদেরও অন্তর্ভুক্ত করে নিবো (যা পারিশ্রমিক থেকে হাজারগুণ মূল্যবান)। কুরআনে কারীমের এক আয়াতে এ কথা তুলে ধরা হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

قَالَ نَعَمْ وَاِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ○

অর্থঃ সে (ফেরাউন) বললো, হ্যাঁ, এবং অবশ্যই তোমরা আমার নিকটবর্তী লোক হয়ে যাবে। (সূরা আ‘রাফ, আয়াত: ১১৪)

ফেরাউনের সাথে এসব কথাবার্তা বলে নেওয়ার পর যাদুকররা হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালামের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতার স্থান ও সময় সাব্যস্ত করিয়ে নিলো। এক বিস্তৃত ময়দানে এবং এক উৎসবের দিনে সূর্যোদয়ের কিছুক্ষণ পরে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সময় নির্দিষ্ট হলো। এ সম্পর্কে কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

قَالَ مَوۡعِدُكُمۡ يَوۡمُ الزِّيۡنَةِ وَاَنۡ يُّحۡشَرَ النَّاسُ ضُحًى ○

অর্থঃ হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালাম বললেন, তোমাদের নির্ধারিত সময় তোমাদের উৎসবের দিন এবং লোকজন যেন পূর্বাহ্নেই সমবেত হয়। (সূরা ত্ব-হা, আয়াত: ৫৯)

কোন কোন রেওয়ায়াতে বর্ণিত আছে, এ সময় যাদুকরদের সরদারের সাথে হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালাম আলোচনা করলেন, আমি যদি তোমাদের উপর বিজয় লাভ করি, তবে তোমরা ঈমান গ্রহণ করবে তো? তারা বললো, আমাদের কাছে এমন মহাযাদু রয়েছে, যার উপর কেউ জয়ী হতে পারে না। কাজেই আমাদের পরাজয়ের প্রশ্ন উঠতে পারে না। তথাপি যদি আপনি জয়ী হয়ে যান, তা হলে প্রকাশ্য ঘোষণার মাধ্যমে ফেরাউনের চোখের সামনে আমরা আপনার প্রতি ঈমান গ্রহণ করবো। (আল-জামি‘লিআহকামিল কুরআন লিল কুরতুবী)

অতঃপর প্রতিদ্বন্দ্বিতার ময়দানে যখন সবাই সমবেত হলো তখন যাদুকররা হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালামকে উদ্দেশ্য করে যা বলেছিল, এক আয়াতে সে কথাই বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

قَالُوۡا يٰمُوۡسٰۤى اِمَّاۤ اَنۡ تُلۡقِىَ وَاِمَّاۤ اَنۡ نَّكُوۡنَ نَحۡنُ الۡمُلۡقِيۡنَ ○

অর্থঃ তারা বললো, হে মুসা, হয় আপনি নিক্ষেপ করুন না- হয় আমরা নিক্ষেপকারী হই। (সূরা আ‘রাফ, আয়াত: ১১৫)

যাদুকরদের এই উক্তিটি ছিল নিজেদের নিশ্চিন্ততা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে যে, এ ব্যাপারে আমাদের কোন পরোয়াই নেই- প্রথমে আমরা শুরু করবো, না আপনি। কারণ, আমরা নিজেদের যাদুশাস্ত্রের ব্যাপারে সম্পূর্ণ আশ্বস্ত।

তাদের বর্ণনাভঙ্গিতে একথা বুঝা যায় যে, তারা মনে মনে প্রথম আক্রমণের প্রত্যাশী ছিল। কিন্তু নিজেদের শক্তিমত্তা ও বাহাদুরি প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালামকে জিজ্ঞেস করে নিলো, প্রথমে আপনি আরম্ভ করবেন, না আমরা।

হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালাম তাদের উদ্দেশ্য উপলব্ধি করে নিজের মুজিযা সম্পর্কে পরিপূর্ণ নিশ্চয়তার দরুন প্রথমে তাদেরই সুযোগ দিলেন। পবিত্র কুরআনের ভাষায়, قَالَ اَلْقُوْا “তিনি বললেন, তোমরাই আগে নিক্ষেপ করো।”

আল্লামা ইসমাঈল ইবনে কাসীর রহ. তার বিখ্যাত তাফসীরগ্রন্থ “তাফসীরুল কুরআনিল আযীমে” একটি রেওয়ায়েত উল্লেখ করেছেন। সেখানে বলা হয়েছে, যাদুকররা হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালামের প্রতি আদব প্রদর্শন ও সম্মানজনক ব্যবহার করতে গিয়েই প্রথম সুযোগ নেওয়ার জন্য তাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। তাই এর পরিপ্রেক্ষিতে তাদের ঈমান আনার সৌভাগ্য হয়েছিল। তবে

আগেই বলা হয়েছে, মুসা ‘আলাইহিস সালাম সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ না করে তাদেরই প্রথমে নিক্ষেপ করার জন্য বললেন।

সুতরাং যাদুকররা-ই প্রথমে তাদের লাঠি ও দড়িগুলো নিক্ষেপ করলো। সঙ্গে সঙ্গে সেসব দিয়ে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল, এক আয়াতে সে সম্পর্কে বলা হয়েছে,

فَلَمَّآ اَلْقَوْا سَحَرُوْٓا اَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوْهُمْ وَجَآءُوْا بِسِحْرٍ عَظِيْمٍ ○

অর্থঃ যখন তারা নিক্ষেপ করলো, তখন তারা লোকদের চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দিলো এবং তাদের ভীত-সন্ত্রস্ত করে তুললো। তারা প্রদর্শন করলো এক মহাযাদু। (সূরা আ‘রাফ, আয়াত: ১১৬)

অর্থাৎ যাদুকররা তাদের লাঠি ও রশিগুলো মাটিতে নিক্ষেপ করার সাথে সাথে সেগুলো বড় বড় সাপ হয়ে ছোটাছুটি শুরু করলো। এভাবে তারা দর্শকদের নজরবন্দি করে দিয়ে এক মস্তবড় যাদু দেখালো। তাদের যাদু দিয়ে উপস্থিত লোকজন খুবই প্রভাবান্বিত হলো এবং বড় বড় বহুসংখ্যক সাপ দেখে তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে গেল।

এই আয়াতের দিয়ে বুঝা যায়, তাদের যাদু ছিল একপ্রকার নজরবন্দি। যাতে দর্শকদের মনে থেকে লাগলো, এই লাঠি ও দড়িগুলো সাপ হয়ে ছোটাছুটি করছে। অথচ প্রকৃতপক্ষে সেগুলো আগের মতোই লাঠি ও দড়ি ছিল। বাস্তবে সেগুলো কোন সাপ হয়নি। বস্তুত এটা এক প্রকার সম্মোহনীশক্তি ছিলো, যার প্রভাব মানুষের কল্পনা ও দৃষ্টিকে ধাঁধিয়ে দিয়েছিলো।

এই পরিস্থিতিতে আল্লাহ তা‘আলা তার নবী হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালামকে যে নির্দেশ দিলেন, কুরআন মজীদের এক আয়াতে এভাবে তার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে,

وَاَوۡحَيۡنَاۤ اِلٰى مُوۡسٰۤى اَنۡ اَلۡقِ عَصَاكَ فَاِذَا هِىَ تَلۡقَفُ مَا يَاۡفِكُوۡنَ ○

অর্থঃ তারপর আমি ওহীর মাধ্যমে মুসা ‘আলাইহিস সালামকে বললাম, আপনার লাঠিখানা নিক্ষেপ করুন। তা নিক্ষেপ করার সঙ্গে সঙ্গে সে (মুসা ‘আলাইহিস সালাম এর সাপ), সবগুলোকে (যাদুকরদের সাপগুলোকে) গিলতে লাগলো, যা তারা বানিয়েছিল যাদুর বলে। (সূরা আ‘রাফ, আয়াত: ১১৭)

অর্থাৎ আল্লাহ তা‘আলার নির্দেশে মুসা ‘আলাইহিস সালাম তার লাঠিখানা মাটিতে ফেলে দিতেই লাঠিটি সবচেয়ে বড় সাপে পরিণত হয়ে যাদুকরদের সকল সাপ গিলে খেতে শুরু করলো।

ঐতিহাসিক- বর্ণনায় রয়েছে, হাজার হাজার যাদুকরের হাজার হাজার লাঠি ও রশি যখন সাপ হয়ে দৌড়াতে লাগলো, তখন সমগ্র মাঠ সাপে ভরে গেল এবং সমবেত দর্শকদের মাঝে তাতে এক অদ্ভুত ভীতির সঞ্চার হলো। এমনকি হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালামও কিছুটা বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। কুরআনে কারীমে এই দিকেই ইংগিত করে বলা হয়েছে,

فَاِذَا حِبَالُهُمۡ وَعِصِيُّهُمۡ يُخَيَّلُ اِلَيۡهِ مِنۡ سِحۡرِهِمۡ اَنَّهَا تَسۡعٰى ○ فَاَوۡجَسَ فِىۡ نَفۡسِهٖ
خِيۡفَةً مُّوۡسٰى ○ قُلۡنَا لَا تَخَفۡ اِنَّكَ اَنۡتَ الۡاَعۡلٰى ○

অর্থঃ তাদের যাদুক্রিয়ার প্রভাবে তার মনে হলো, যেন হঠাৎ তাদের রশি ও লাঠিগুলো সাপ হয়ে ছোটাছুটি করছে।

তখন মুসা ‘আলাইহিস সালাম মনে মনে কিছুটা ভীতি অনুভব করলেন। আমি বললাম, ভয় করবেন না, নিশ্চয় আপনিই বিজয়ী হবেন। (সূরা ত্ব-হা, আয়াত: ৬৬-৬৮)

কিন্তু হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালাম তার এই ভয় মনের ভেতর গোপন রাখলেন। প্রকাশ হতে দেননি। এই ভয় যদি প্রাণনাশের ভয় হয়ে থাকে, তবে মানুষ হিসাবে এরূপ হওয়া নবুওয়্যাতের পরিপন্থী নয়। কিন্তু বাহ্যত বুঝা যায়, এটা প্রাণনাশের ভয় ছিল না; বরং তিনি আশঙ্কা করছিলেন, এরা লাঠি ও দড়ি ফেলেছে, তাতে সেগুলো সাপ হয়ে গিয়েছে। এমতাবস্থায় যখন আমি লাঠি ফেলবো, তাও সাপ হয়ে যাবে। তাতে তো সব এক রকমই হয়ে গেল। সুতরাং মানুষ নবুওয়্যাতের মুজিযার পার্থক্য করবে কিভাবে!

অপরদিকে তিনি ভাবলেন, আমার সাপ মাত্র একটা হবে, অথচ তাদের সাপের সংখ্যা অনেক বেশি। এই পরিপ্রেক্ষিতে এ মহাসমাবেশের সামনে যদি যাদুকররা জিতে যায়, তবে নবুওয়্যাতের দাওয়াতের উদ্দেশ্য তো পূর্ণ হতে পারবে না। এর জবাবে আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে বলা হয়েছে,

لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰى

অর্থঃ আপনি ভয় পাবেন না, আপনিই বিজয়ী হবেন।

এতে আল্লাহর নবী হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালামকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, যাদুকররা জয়ী হতে পারবে না। আপনিই তাদের উপর বিজয় ও প্রাধান্য লাভ করবেন। এভাবে তার উপরোক্ত আশঙ্কা দূর করে দেওয়া হয়।

যাদুকরদের পরাজয় ও ঈমান গ্রহণ

এরপর যখন হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালাম আপন রবের আদেশ মোতাবেক লাঠিখানা মাটিতে নিক্ষেপ করলেন, তা বিশাল এক অজগরের আকার ধারণ করে যাদুকরদের তৈরীকৃত কৃত্রিম সাপগুলো গিলে খেয়ে ফেললো। এই দৃশ্য দেখে যাদুকররা হতভম্ব হয়ে গেল। তারা বুঝতে পারল, মুসা ‘আলাইহিস সালাম যা দেখালেন, তা কোনক্রমেই যাদু নয়। বরং অসীম কুদরতের বহিঃপ্রকাশ। সুতরাং মুসা ‘আলাইহিস সালাম যে সত্য নবী এবং তার রবের ঈমানের দাওয়াত যে সম্পূর্ণ হক ও সত্য, তা তাদের সামনে দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে গেল। তাই সঙ্গে সঙ্গে তারা ঈমান গ্রহণ করলো এবং এর ঘোষণা দিলো। কুরআনুল কারীমে এ সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে,

فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ○ فَغُلِبُوْا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوْا صَاغِرِيْنَ○ وَأُلْقِيَ
السَّحَرَةُ سَاجِدِيْنَ○ قَالُوْا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ○ رَبِّ مُوْسٰى وَهَارُوْنَ○

অর্থঃ ফলে সত্য প্রতিষ্ঠিত হলো এবং যাদুকররা যা করেছিলো, তা বাতিল প্রতিপন্ন হয়ে গেল। সুতরাং তারা সেখানেই পরাজিত হয়ে গেল এবং খুবই অপদস্থ হলো। আর যাদুকররা সিজদায় পড়ে গেল। তারা বললো, আমরা ঈমান এনেছি বিশ্বজগতের প্রতিপালকের প্রতি, যিনি হযরত মুসা ও হারুনের প্রতিপালক। (সূরা আ‘রাফ, আয়াত: ১১২-১১৮)

ঐতিহাসিক- বর্ণনায় রয়েছে, যাদুকরদের সরদার মুসলমান হয়ে গেলে, তার দেখাদেখি ফেরাউনের গোত্রের ছয় লক্ষ লোক হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালামের প্রতি ঈমান আনলো

এবং তার ঘোষণা করলো। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বিতর্কের আগে তো শুধু হযরত মুসা ও হারুন আলাইহিমাস সালাম ফেরাউনের বিরোধী ছিলেন, কিন্তু এর পরে লক্ষ লক্ষ লোকের মুসলমান হয়ে যাওয়ার দরুন একটা বিরাট শক্তি ফেরাউনের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ালো।

সেসময় ফেরাউনের ব্যাকুল ও আতংকিত হয়ে পড়াটা একেবারে নিরর্থক ছিল না। কিন্তু সে তা গোপন করে একজন ধূর্ত ও বিজ্ঞ রাজনীতিকের ভঙ্গিতে প্রথমে যাদুকরদের উপর বিদ্রোহমূলক অপবাদ আরোপ করে বললো,

اٰمَنْتُمْ بِهٖ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ

অর্থঃ তোমরা যে আমার অনুমতি দেওয়ার আগেই ঈমান নিয়ে এলে? (সূরা আ'রাফ, আয়াত: ১২৩)

তৎসঙ্গে ফেরাউন চাতুর্যের আশ্রয় নিয়ে যাদুকরদের উপর রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ আরোপ করে বললো, "নিশ্চয় তোমরা মুসা 'আলাইহিস সালামের সাথে গোপন ষড়যন্ত্র করে এ কাজটি দেশ ও জাতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করার উদ্দেশ্যে করেছ।" পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

اِنَّ هٰذَا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوْهُ فِى الْمَدِيْنَةِ

অর্থঃ এটা একটা চক্রান্ত, যা তোমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতার ময়দানে আসার আগেই শহরের ভেতরে নিজেদের মধ্যে স্থির করে রেখেছিলে। (সূরা আ'রাফ, আয়াত: ১২৩)

উক্ত কৈফিয়তটি ছিল হুমকিস্বরূপ। অনুমতির আগে ঈমান আনার কথা বলে মূলত ফেরাউন তার লোকদের আশ্বস্ত করার চেষ্টা করলো, আমার কাম্য ছিল, মুসা 'আলাইহিস

সালামের হকের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ব্যাপারটি যদি প্রতীয়মান হয়ে যায়, তা হলে আমিও তাকে মেনে নেব এবং জনসাধারণকেও মুসলমান হওয়ার জন্য অনুমতি দান করবো। কিন্তু তোমরা তাড়াহুড়া করলে এবং আসল তাৎপর্য না বুঝেই একটা ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে মুসলমান হয়ে গেলে!

এই চাতুর্যের মাধ্যমে একদিকে লোকদের সামনে হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালামের মুজিযা এবং যাদুকরদের ঈমান গ্রহণকে একটা ষড়যন্ত্র সাব্যস্ত করে তাদের বিভ্রান্ত করার ব্যবস্থা করলো। অপরদিকে ফেরাউন রাজনৈতিক এই চাল চালল যে, হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালামের কার্যকলাপ ও যাদুকরদের ইসলাম গ্রহণ শুধু ফেরাউনকে জব্দ করার জন্য অনুষ্ঠিত হয়েছে, জাতি ও জনসাধারণের সাথে যার মোটেই সম্পর্ক ছিল না- একথা বলে সে জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করলো। এ পর্যায়ে এটাকে রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক বিষয়ে পরিণত করার উদ্দেশ্যে সে যাদুকরদের বললো,

لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا

অর্থঃ তোমরা এই ষড়যন্ত্র এই জন্য করেছো যে, তোমরা মিসরের উপর জয়লাভ করে এদেশের অধিবাসীদের এখান থেকে বহিষ্কার করতে চাও।

এই চাতুর্যের পর সবার উপর নিজের আতঙ্ক প্রতিষ্ঠা এবং সরকারের প্রভাব ও ভীতি সঞ্চারিত করার জন্য যাদুকরদের হুমকি দিতে শুরু করলো। প্রথমে সে অস্পষ্ট ভঙ্গিতে বললো,

فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ

অর্থঃ তোমাদের যে কী পরিণতি হবে, তা তোমরা অচিরেই বুঝতে পারবে।

অতঃপর তা পরিষ্কার করে বললো,

لَاُقَطِّعَنَّ اَيۡدِيَكُمۡ وَاَرۡجُلَكُمۡ مِّنۡ خِلَافٍ وَّلَاُصَلِّبَنَّكُمۡ اَجۡمَعِيۡنَ ○

অর্থঃ আমি তোমাদের সকলের হাত ও পা বিপরীতভাবে কেটে তোমাদের সকলকে শূলে চড়িয়ে মারব।

বিপরীতভাবে কর্তন করার অর্থ হলো ডান হাত ও বাম পা কর্তন করা, যেন উভয় পার্শ্বে জখমী হয়ে বেকার হয়ে পড়ে।

ফেরাউন এই দুরবস্থার উপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করার জন্য এবং স্বীয় পরিষদবর্গ ও জনগণকে নিয়ন্ত্রণে রাখার উদ্দেশ্যে যথেষ্ট ব্যবস্থা নিয়েছিল। আর তার উৎপীড়নমূলক শাস্তি আগে থেকেই প্রসিদ্ধ ছিল, যা অন্তরাত্মা কাঁপিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট।

কিন্তু ইসলাম ও ঈমান এমন এক দৌলত যে, যখন তা কারো আত্মায় বদ্ধমূল হয়ে যায়, তখন সে গোটা পৃথিবী ও তার যাবতীয় উপকরণের মোকাবেলা করতে তৈরি হয়ে যায়, তথাপি কোনক্রমেই ঈমান ত্যাগ করতে প্রস্তুত হয় না। তাই তো যেসকল যাদুকর কিছুসময় আগেও ফেরাউনকে নিজেদের খোদা বলে স্বীকার করতো এবং অন্যদেরও এই দীক্ষা দিতো, কয়েক মুহূর্তের ব্যবধানে ইসলামের কালেমা পড়ার সাথে সাথে তাদের মধ্যে এমন ঈমানী জযবা তৈরি হয়ে গেলো, তারা ফেরাউনের যাবতীয় হুমকির উত্তরে বলে উঠলেন,

إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ ○

অর্থঃ অর্থাৎ তুমি যদি আমাদের হত্যা করে ফেলো, তাতে কিছু আসে যায় না। আমরা আমাদের রবের কাছেই তো চলে যাব, যেখানে আমরা সব রকম সুখ-শান্তি লাভ করবো। সুতরাং তুমি আমাদের ব্যাপারে যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার নিতে পার। কুরআন মজীদে যাদুকরদের এই বক্তব্য এভাবে তুলে ধরা হয়েছে,

فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِيْ هٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ○

অর্থঃ অতএব, তুমি যা ইচ্ছা করতে পার। তুমি তো শুধু এই পার্থিব জগতেই (যা করার) করবে। (সূরা ত্ব-হা, আয়াত: ৭২)

শুধু ঈমানের শক্তি এবং আল্লাহর রাহে জিহাদের সৎসাহসই যে তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল, তা-ই নয়, বরং প্রতীয়মান হচ্ছে, তাদের জন্য সত্য ও প্রকৃত মারেফাত জ্ঞানের দ্বারও উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছিল। সে কারণেই ফেরাউনের বিরুদ্ধে এহেন বিবৃতি দেওয়ার সাথে সাথে তারা আল্লাহ তা‘আলার নিকটও প্রার্থনা করলো,

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّتَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ ○

অর্থঃ হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের পরিপূর্ণ ধৈর্য্য দান করুন এবং মুসলমান অবস্থায় আমাদের মৃত্যু দান করুন। (সূরা আ‘রাফ, আয়াত: ১২৬)

ফেরাউনের দীনবিমুখতা ও ভয়-আতঙ্ক

মুসা ‘আলাইহিস সালামের লাঠি বিরাটকায় অজগর সাপ হয়ে যাওয়া এবং ফেরাউনের যাদুকরদের যাদুর সাপগুলো খেয়ে ফেলা, এই সত্য উপলব্ধি করে যাদুকররা ঈমান

গ্রহণের ঘোষণা দেয়। উক্ত মুজিযার বহিঃপ্রকাশের পর ফেরাউন হযরত মুসা ও হারুন আলাইহিমাস সালামের প্রতি ভীত- সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। তাই তার সমস্ত রোষানল যাদুকরদের উপরেই সীমাবদ্ধ থাকলো। মুসা ‘আলাইহিস সালাম সম্পর্কে ফেরাউনের মুখ দিয়ে কোন কথাই বের হলো না। অথচ তিনিই ছিলেন আসল প্রতিপক্ষ। তাই তার সম্প্রদায়ের লোকেরা বলতে লাগলো,

اَتَذَرُ مُوْسٰى وَقَوْمَهٗ لِيُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ وَيَذَرَكَ وَاٰلِهَتَكَ

অর্থঃ আপনি কি মুসা ও তার সম্প্রদায়কে এমনি ছেড়ে দিবেন, দেশময় ফাসাদ সৃষ্টি করার জন্য এবং আপনাকে ও আপনার দেব- দেবীদের বর্জন করে চলার জন্য। (সূরা আ‘রাফ, আয়াত: ১২৭)

তখন বাধ্য হয়ে ফেরাউন বললো,

سَنُقَتِّلُ اَبْنَآءَهُمْ وَنَسْتَحْيٖ نِسَآءَهُمْ وَاِنَّا فَوْقَهُمْ قٰهِرُوْنَ

অর্থঃ আমি অতিসত্বর হত্যা করবো তাদের পুত্রসন্তানদের। আর জীবিত রাখবো তাদের মেয়েদের। বস্তুত আমরা তাদের উপর প্রতাপশালী। (সূরা আ‘রাফ, আয়াত: ১২৭)

মুফাসসিরগণ বলেন, সম্প্রদায়ের এহেন জেরার মুখেও ফেরাউন একথাই বললো, আমরা বনী ইসরাইলের ছেলেসন্তানদের হত্যা করে দিবো, কিন্তু হযরত মুসা ও হারুন আলাইহিমাস সালাম সম্পর্কে তখনও তার মুখ থেকে কোন কথাই বের হলো না। তার কারণ হলো, হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালামের উল্লিখিত মুজিযা এবং তার পরবর্তী ঘটনা ফেরাউনের মন- মস্তিষ্কে হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালামের ব্যাপারে কঠিন ভীতির সঞ্চার করে দিয়েছিল।

হযরত সায়িদ ইবনে যুবাইর রহ. বলেন, হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালামের মুজিযা ফেরাউনের উপর এমন প্রভাব বিস্তার করেছিল, যখনই সে হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালামকে দেখত, তখনই অবচেতনভাবে তার প্রস্রাব বেরিয়ে যেত।

এই ঘটনার পর ঐতিহাসিক-বর্ণনা অনুযায়ী, হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালাম বিশ বছর যাবত মিসরে অবস্থান করে সেখানকার অধিবাসীদের আল্লাহ তা‘আলার বাণী শোনান এবং আল্লাহর দীনের দাওয়াত দিতে থাকেন। কিন্তু বনী ইসরাইল ঈমান আনলেও ফেরাউন ও তার কওম ঈমান আনল না। তখন আল্লাহ তা‘আলা তাদের প্রতি একে একে বিভিন্ন আযাব অবতীর্ণ করেন।

ফেরাউন ও তার কওমের উপর আপতিত আযাব

আল্লাহ তা‘আলা হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালামকে নয়টি মুজিযা দান করেছিলেন। এগুলোর উদ্দেশ্য ছিল ফেরাউনের সম্প্রদায়কে সতর্ক করে সত্য পথে আনা। এ সম্পর্কে কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى تِسْعَ اٰيٰتٍ...

অর্থঃ আমি মুসা ‘আলাইহিস সালামকে নয়টি প্রকাশ্য মুজিযা প্রদান করেছিলাম। (সূরা বনী-ইসরাঈল, আয়াত: ১০১)

اٰيَةٌ শব্দটি মুজিযার অর্থেও ব্যবহৃত হয়, আসমানি কিতাবের আয়াত বা আহকামে ইলাহীর অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এখানে উভয় অর্থের সম্ভাবনা রয়েছে। বহু তাফসীরবিদ এই স্থলে اٰيَةٌ - এর অর্থ মুজিযা নিয়েছেন।

‘নয়’ সংখ্যা উল্লেখ করা হলেও মুসা সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুজিযার সংখ্যা আরো বেশি ছিল, কিন্তু এখানে নয়টি মুজিযার বিশেষ গুরুত্বের কারণে নয় সংখ্যাটি উল্লেখ করা হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. উক্ত নয়টি মুজিযা এভাবে গণনা করেছেন, ১. মুসা ‘আলাইহিস সালামের লাঠি, যা যমিনে ফেললেই অজগর সাপ হয়ে যেত। ২. মুসা ‘আলাইহিস সালামের শুভ্র হাত, যা বগলের নিচ থেকে বের করতেই উজ্জ্বল হয়ে চমকাতে থাকতো। ৩. মুসা ‘আলাইহিস সালামের মুখে তোতলামি ছিল, যা অলৌকিকভাবে দূর করে দেওয়া হয়েছিল। ৪. বনী ইসরাইলকে নদী পার করানোর জন্য নদী বিভক্ত করে বারোটি রাস্তা করে দেওয়া হয়েছিল। ৫. ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের উপর পঙ্গপালের আযাব এসেছিল। ৬. তাদের প্রতি তুফানের আযাব প্রেরণ করা হয়েছিল। ৭. তাদের শরীরে উঁকুনের আযাব প্রেরণ করা হয়েছিল। ৮. ব্যাঙের আযাব চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ৯. তাদের উপর রক্তের আযাব প্রেরণ করা হয়েছিল।

এই নয়টি মুজিযার মধ্যে প্রথম দুটি অর্থাৎ লাঠি সাপ হওয়া এবং হাত জ্যোতির্ময় হওয়া ফেরাউনের দরবারে প্রকাশিত হয়। লাঠি সাপ হয়ে যাওয়ার মুজিযার মাধ্যমেই হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালাম যাদুকরদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করেন। আর ৫নং থেকে ৯নং পর্যন্ত বর্ণিত পাঁচটি মুজিযা ফেরাউন ও তার কওমের উপর আযাব-গজব নাযিল সংক্রান্ত।

ফেরাউনের কওমের উপর দুর্ভিক্ষের আযাব

অবশ্য এই পাঁচটি আযাব ছাড়াও ফেরাউন ও তার কওমের উপর আরো আযাব অবতীর্ণ হয়েছে বলে বর্ণিত আছে। যেমন, ফেরাউন ও তার কওমের উপর দুর্ভিক্ষের আযাব নাযিল হওয়ার বিষয়েও পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

وَلَقَدْ اَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِيْنَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ

অর্থঃ আমি পাকড়াও করেছিলাম ফেরাউনের অনুসারীদের দুর্ভিক্ষ ও ফল-ফসলের ক্ষয়-ক্ষতি দিয়ে, যেন তারা হিদায়াত গ্রহণ করে। (সূরা আ‘রাফ, আয়াত: ১৩০)

যখন ফেরাউনের সম্প্রদায়ের হঠকারিতা ও দুরাচরণের ফলে দুর্ভিক্ষের আগমন হয়েছিল, তখন তাদের ক্ষেতের ফসল ও বাগ-বাগিচার উৎপাদন চরমভাবে হ্রাস পায়। যার দরুন তারা অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত তারা ঈমান আনার অঙ্গীকার করে হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালামের মাধ্যমে দুর্ভিক্ষ থেকে মুক্তিলাভের দু‘আ করায়। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, মুসা ‘আলাইহিস সালামের দু‘আয় দুর্ভিক্ষ রহিত হয়ে গেলে, পুনরায় তারা অহংকার প্রদর্শন করে এবং ঈমান আনতে অস্বীকার করে। উপরন্তু তারা বলতে শুরু করে, এই দুর্ভিক্ষ মুসা ‘আলাইহিস সালাম ও তার সঙ্গী-সাথীদের কুলক্ষণের দরুনই আপতিত হয়েছিল। আর এখন যে দুর্ভিক্ষ রহিত হয়ে গিয়েছে, তা হলো আমাদের সৎকর্মের স্বাভাবিক ফল। এমনটিই তো আমাদের প্রাপ্য।

তেমনিভাবে তারা যেকোনো ভালো কিছু পেলে তা নিজেদের কৃতিত্ব মনে করতে থাকে এবং মন্দ ও দুর্দশার সম্মুখীন

হলে সেটা মুসা ‘আলাইহিস সালাম ও তার অনুসারীদের কারণে হয়েছে বলে চালিয়ে দিতে থাকে। পবিত্র কুরআনে এ বিষয়টি এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে,

فَاِذَا جَآءَتۡهُمُ الۡحَسَنَةُ قَالُوۡا لَنَا هٰذِهٖ وَاِنۡ تُصِبۡهُمۡ سَيِّئَةٌ يَّطَّيَّرُوۡا بِمُوۡسٰى وَمَنۡ مَّعَهٗ اَلَا اِنَّمَا طٰٓئِرُهُمۡ عِنۡدَ اللّٰهِ وَلٰـكِنَّ اَكۡثَرَهُمۡ لَا يَعۡلَمُوۡنَ

অর্থঃ যখন ভালো দিন ফিরে আসে, তখন তারা বলতে আরম্ভ করে, “আমাদের জন্যই তো এটা।” আর যদি কোন অকল্যাণ এসে উপস্থিত হয়, তবে তার জন্য মুসা ‘আলাইহিস সালাম এবং তার সঙ্গীদের অলক্ষুণে মনে করে। শুনে রাখো, তাদের অলক্ষুণের কথা আল্লাহ তা‘আলারই জানা আছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না। (সূরা আ‘রাফ, আয়াত: ১৩১)

বহু প্রচেষ্টার পরও ফেরাউনসম্প্রদায় হিদায়াতের পথে না আসায় আল্লাহ তা‘আলা তাদের উপর একের পর এক নানান আযাব-গজব নাযিল করেন। এ সম্পর্কে কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

فَاَرۡسَلۡنَا عَلَيۡهِمُ الطُّوۡفَانَ وَالۡجَرَادَ وَالۡقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ اٰيٰتٍ مُّفَصَّلٰتٍ

অর্থঃ তখন আমি তাদের উপর পাঠালাম তুফান, পঙ্গপাল, উঁকুন, ব্যাঙ ও রক্ত বহুবিধ নিদর্শন একের পর এক। (সূরা আ‘রাফ, আয়াত: ১৩৩)

এই আয়াতে ফেরাউনের সম্প্রদায়ের উপর আপতিত পাঁচ রকমের আযাবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এসব আযাব 'اٰيٰتٍ مُّفَصَّلٰتٍ' (বহুবিধ নিদর্শন একের পর এক) বলার তাৎপর্য সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন,

এগুলোর মধ্যে প্রত্যেকটি আযাবই নির্ধারিত সময় পর্যন্ত অবস্থান করে। অতঃপর রহিত হয়ে যায়। এরপর কিছুসময় বিরতি দিয়ে পুনরায় দ্বিতীয় বা তৃতীয় কিংবা তৎপরবর্তী আযাবগুলো পৃথক পৃথকভাবে আসে।

ইবনে মুনযির, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. - এর রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন, এগুলোর প্রতিটি আযাব ফেরাউনগোষ্ঠীর উপর সাতদিন করে স্থায়ী হয়। শনিবার শুরু হয়ে দ্বিতীয় শনিবারে রহিত হয়ে যেত এবং পরবর্তী আযাব আসা পর্যন্ত তিন সপ্তাহর অবকাশ দেওয়া হত।

ইমাম বাগাবী রহ. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, প্রথমবার যখন ফেরাউনের কওমের উপর দুর্ভিক্ষের আযাব আপতিত হয় এবং হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালামের দু‘আয় তা রহিত হয়ে যায়। কিন্তু তারা নিজেদের নাফরমানী থেকে বিরত হয় না। তখন হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালাম প্রার্থনা করেন, হে আমার পালনকর্তা, এরা এতই অহংকারী যে, দুর্ভিক্ষের আযাবে কোনরূপ প্রভাবিত হয়নি। তারা নিজেদের কৃত ঈমান আনার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছে। সুতরাং তাদের উপর এমন কোন আযাব চাপিয়ে দিন, যা হবে তাদের জন্য বেদনাদায়ক ও আমাদের জাতির জন্য উপদেশ গ্রহণের উপায় এবং যা পরবর্তীদের জন্য হবে সংশোধনমূলক শিক্ষা। তখন আল্লাহ তা‘আলা প্রথমে তাদের উপর তুফানের আযাব নাযিল করেন।

প্রখ্যাত মুফাসসিরগণের মতে, এখানে তুফান অর্থ পানির তুফান। অর্থাৎ জলোচ্ছ্বাস। তাতে ফেরাউনের সম্প্রদায়ের

TOP

সমস্ত ঘর-বাড়ি ও জমি-জমা জলোচ্ছ্বাসে তলিয়ে যায়। না থাকে কোথাও তাদের শোয়া-বসার জায়গা, না থাকে জমি চাষাবাদের কোন ব্যবস্থা।

আশ্চর্যের বিষয় ছিল, ফেরাউন গোত্রের সন্দেহ ছিল বনী ইসরাইলের ঘর-বাড়ি ও জমি-জমা জলোচ্ছ্বাসে ডুবে গেছে অথচ বনী ইসরাইলের ঘর-বাড়ি ও জমি-জমা সবই ছিল শুকনো, স্বাভাবিক। সেগুলোর কোথাও জলোচ্ছ্বাসের কোন পানি ছিল না। কিন্তু ফেরাউন সম্প্রদায়ের জমি ছিল অথৈ পানির নিচে।

এই জলোচ্ছ্বাসে ভীত হয়ে ফেরাউনসম্প্রদায় মুসা ‘আলাইহিস সালামের নিকট আবেদন জানালো, আপনার পালনকর্তার দরবারে দু‘আ করুন, যাতে এই আযাব দূর হয়ে যায়। তা হলে আমরা ঈমান আনবো এবং বনী ইসরাইলকে মুক্ত করে দিবো। তখন হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালাম দু‘আ করলেন। তার দু‘আর ফলে জলোচ্ছ্বাসের তুফান রহিত হয়ে গিয়ে তাদের শস্য-ফসলক্ষেত্র আগের চেয়েও অধিক সুজলা-সুফলা হয়ে উঠলো।

তখন সেই নাফরমানরা বলতে শুরু করলো, আদতে এই তুফান কোন আযাব ছিল না। বরং আমাদের ফায়দার জন্যই তা এসেছিল। যার ফলে আমাদের শস্যভূমির উৎপাদন-ক্ষমতা বেড়ে গেছে। মুসা ‘আলাইহিস সালামের এতে কোন ভূমিকা নেই। সুতরাং আমরা ঈমান আনবো না। এসব কথা বলে তারা ঈমান আনার ব্যাপারে কৃত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করলো।

এমতাবস্থায় তারা মাসাধিককাল সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে থাকে। মেহেরবান আল্লাহ তাদের চিন্তা-ভাবনার জন্য

অবকাশ দান করেন। কিন্তু তাদের চৈতন্যের উদয় হলো না। তখন আল্লাহ তা‘আলা তাদের উপর পঙ্গপালের আযাব নাযিল করলেন। এই পঙ্গপাল তাদের সমস্ত শস্য-ফসল ও বাগানের ফল-ফলাদি খেয়ে নিঃশেষ করে ফেললো। কোন কোন রেওয়ায়াতে এসেছে, কাঠের দরজা-জানালা, ছাদ প্রভৃতিসহ ঘরের ব্যবহার্য্য আসবাবপত্র পঙ্গপাল খেয়ে শেষ করে ফেলেছিল।

ফেরাউনের কওম ঈমান গ্রহণে বারবার ওয়াদা ভঙ্গ করলো

এই আযাবের ক্ষেত্রেও হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালামের মুজিযা পরিলক্ষিত হয় যে, সমস্ত পঙ্গপাল শুধু কিবতী বা ফেরাউনের সম্প্রদায়ের শস্যক্ষেত ও ঘর-বাড়িতে ভরে গিয়েছিল। অথচ পাশাপাশি থাকা সত্ত্বেও ইসরাইলীদের ঘর-বাড়ি, শস্যভূমি ও বাগ-বাগিচা সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকে।

এবারও ফেরাউনের সম্প্রদায় চিৎকার করতে লাগলো এবং হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালামের নিকট পুনরায় আবেদন জানালো, এবার আপনি আল্লাহ তা‘আলার দরবারে দু‘আ করে আযাব সরিয়ে দিলে আমরা পাক্কা ওয়াদা করছি, ঈমান আনবো এবং বনী ইসরাইলকে মুক্তি দিয়ে দিবো।

তখন হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালাম আবার আল্লাহ তা‘আলার নিকট দু‘আ করলেন। তাতে এ আযাব সরে গেল।

উক্ত আযাব সরে যাওয়ার পর তারা দেখলো, আমাদের কাছে এখনও যে পরিমাণ খাদ্য-শস্য মজুদ রয়েছে তা আমরা আরো বছরকাল খেতে পারবো। এ কথা ভেবে আবার তারা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করলো। তারা ঈমান আনলো না

এবং বনী ইসরাইলকে মুক্তিও দিলো না। উল্টো তারা অহংকার প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হলো।

এই অবস্থায় আল্লাহ তা'আলা তাদের আবার এক মাসের জন্য অবকাশ দান করলেন। কিন্তু অবকাশের সুযোগ পেয়েও তাদের বোধোদয় হলো না। তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর কুম্মাল (قُمَّلْ)- এর আযাব অবতীর্ণ করলেন।

কুম্মাল সেই উকুনকে বলা হয়, যা মানুষের চুলে বা কাপড়ে জন্মে থাকে এবং সেসব পোকা বা কীটকেও বলা হয়, যা কোন কোন সময় খাদ্য- শস্যে পড়ে এবং যাকে সাধারণত ঘূণ ও কেরি পোকা বলা হয়। ফেরাউন সম্প্রদায়ের উপর উকুন- এর আযাবে উক্ত উভয় রকমের পোকাই অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাদের খাদ্য- শস্যেও ঘূণ ধরেছিল এবং শরীরে, মাথায় ও কাপড়েও উকুন পড়েছিল বিপুল পরিমাণে।

সেই ঘূণের ফলে খাদ্যশস্যের এই অবস্থা দাঁড়িয়েছিল যে, দশ সের গমে তিন সের আটাও হতো না। আর উকুন তাদের চুল; এমনকি ভ্রু পর্যন্ত খেয়ে ফেলছিল এবং তাদের অস্থির করে তুলেছিল।

ফেরাউনের সম্প্রদায় আবার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো এবং হযরত মুসা 'আলাইহিস সালামের কাছে এসে ফরিয়াদ জানালো, এবার আর আমরা অঙ্গীকার ভঙ্গ করবো না। দয়া করে আপনি দু'আ করুন।

তাদের কথায় হযরত মুসা 'আলাইহিস সালাম দু'আ করলেন। তার দু'আয় এই আযাবও চলে গেল। কিন্তু সেই

হতভাগারা নিজেদের জন্য ধ্বংসই টেনে আনতে চাচ্ছিল। তাই তারা এবারও প্রতিজ্ঞা পূরণ করলো না।

তারপর আবার তাদের এক মাসের অবকাশ দেওয়া হয়। এ সময় প্রচুর আরাম-আয়েশে তাদের দিন কাটলো। কিন্তু তারা যখন এই অবকাশেরও কোন মূল্যায়ন করলো না, তখন তাদের নিকট পাঠানো হলো ব্যাঙ-এর আযাব। তখন এত অধিক পরিমাণে ব্যাঙ তাদের ঘরে জন্মালো, কোনস্থানে বসতে গেলে, গলা পর্যন্ত উঠতো ব্যাঙের স্তূপ। শুতে গেলে তারা ব্যাঙের স্তূপের নিচে তলিয়ে যেত। এই অবস্থায় পার্শ্ব পরিবর্তন করাও অসম্ভব হয়ে পড়তো। তেমনিভাবে রান্নার হাঁড়ি, চাল-ডালের মটকা বা টিন সবকিছুই ব্যাঙে ভরে যেত।

এই আযাবে অস্থির হয়ে ফেরাউন সম্প্রদায় বিলাপ করতে লাগলো এবং অনেক অনুনয়-বিনয় করে হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালামকে দু‘আ করতে অনুরোধ জানিয়ে বললো, এবার এই অবস্থা কেটে গেলে আমরা অবশ্যই ঈমান আনবো, এর অন্যথা হবে না।

তাই দয়াপরবশ হয়ে হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালাম দু‘আ করলেন। তখন সেই আযাব দূর হয়ে গেল। কিন্তু যে জাতির অন্তর নাফরমানীতে মোহরাঙ্কিত হয়ে যায়, তাদের বুদ্ধি-বিবেচনা ও জ্ঞান-চেতনা কোন কাজই করে না। তাই তো এত ঘটনার পরেও আযাব থেকে মুক্তি পেয়ে এরা আবারও হঠকারিতায় লিপ্ত হলো এবং ঈমান গ্রহণ করলো না। উল্টো তারা বলতে আরম্ভ করলো, এবার আমাদের বিশ্বাস আরো

দৃঢ় হয়ে গিয়েছে, মুসা একজন মহাযাদুকর, আর এসবই তার যাদুর কীর্তি- কাণ্ড।

অতঃপর আরেক মাসের জন্য আল্লাহ তা'আলা তাদের অবকাশ দান করলেন। কিন্তু এই সুযোগও তারা গ্রহণ করলো না। তখন তাদের উপর আপতিত হলো রক্তের আযাব। তাদের সমস্ত পানাহারের বস্তু রক্তে রূপান্তরিত হয়ে গেল। কূপ কিংবা হাউজ ইত্যাদি থেকে পানি তুলে আনলে, তা রক্তে পরিণত হয়ে যেত। খাবার রান্না করার জন্য দ্রব্যাদি তৈরি করে নিলে, তাও রক্ত হয়ে যেত।

কিন্তু এ সমস্ত আযাবের ক্ষেত্রেই হযরত মুসা 'আলাইহিস সালামের মুজিযা বারবার প্রকাশ পেতে থাকে যে, যে কোনো আযাব হতে ইসরাইলীরা থাকে মুক্ত ও নিরাপদ। রক্তের আযাবের সময় কিবতী তথা ফেরাউন গোত্রের লোকেরা বনী ইসরাইলের কারো বাড়ি থেকে পানি চাইতো, কিন্তু তা তাদের হাতে যাওয়া মাত্র রক্তে পরিণত হয়ে যেত। একই দস্তরখানে বসে কিবতী ও বনী ইসরাইল খাবার খেতে গেলে, যে লোকমাটি বনী ইসরাইলীরা তুলতো, তা স্বাভাবিক অবস্থায় থাকতো, কিন্তু যে লোকমা বা পানির ঢোক কোন কিবতী মুখে তুলতো, তা সঙ্গে সঙ্গে রক্ত হয়ে যেত।

এ আযাবও পূর্ব রীতি অনুযায়ী এক সপ্তাহ পর্যন্ত স্থায়ী হলো এবং এ সময় সেই দুরাচার জাতি বিলাপ করতে লাগলো। অতঃপর তারা হযরত মুসা 'আলাইহিস সালামের নিকট কাকুতি- মিনতি করতে লাগলো এবং অধিকতর দৃঢ়ভাবে

ওয়াদা করলো, এই আযাব দূর হয়ে গেলে তারা ঈমান আনবে।

তাই হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালাম দু‘আ করলেন। তখন এই আযাব সরে গেল। কিন্তু এরা আগের মতোই গোমরাহিতে অটল থাকলো। ঈমান আনলো না। এ বিষয়ে কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে,

فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ○

অর্থঃ তারা আত্মগরিমা প্রদর্শন করতে থাকলো। বস্তুত এরা ছিল অপরাধে অভ্যস্ত জাতি। (সূরা আ‘রাফ, আয়াত: ১৩৩)

অতঃপর সপ্তম আযাবের আলোচনার আয়াতে একে রিজয (رِجْز) বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই শব্দটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্লেগ রোগকে বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়। অবশ্য বসন্ত প্রভৃতি মহামারিকেও রিজয বলা হয়। এক রেওয়ায়াতে উল্লেখ রয়েছে, ফেরাউনের সম্প্রদায়ের উপর এমন ভয়াবহ প্লেগের মহামারি চাপিয়ে দেওয়া হয়, এতে তাদের সত্তর হাজার লোকের মৃত্যু ঘটে।

তখন আবার তারা মুসা ‘আলাইহিস সালামের নিকট কাকুতি-মিনতি করে দু‘আ করার জন্য নিবেদন করলো এবং জোরালোভাবে ঈমান আনার ব্যাপারে ওয়াদা করলো।

হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালাম পুনরায় দু‘আ করলেন। যার ফলে প্লেগের আযাব তাদের উপর থেকে সরে গেল।

কিন্তু পরিতাপের বিষয়, এবারও তারা আগের মতোই ওয়াদা ভঙ্গ করলো। পবিত্র কুরআনের এই আয়াতে তা-ই বর্ণনা করা হয়েছে,

وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوْا يٰمُوْسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ ۚ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا
الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ○ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ اِلٰٓى
اَجَلٍ هُمْ بٰلِغُوْهُ اِذَا هُمْ يَنْكُثُوْنَ○

অর্থঃ যখন তাদের উপর রিজয-এর আযাব আপতিত হলো, তখন তারা বললো, হে মুসা, আমাদের জন্য আপনার পালনকর্তার নিকট সে বিষয়ে দু'আ করুন, যা তিনি আপনার সাথে ওয়াদা করে রেখেছেন। যদি আপনি আমাদের উপর থেকে এ আযাব দূর করে দেন, তা হলে অবশ্যই আমরা আপনার কথা মেনে ঈমান আনবো এবং বনী ইসরাইলকে আপনার সাথে যেতে দেব। অতঃপর যখন আমি তাদের উপর থেকে আযাব তুলে নিলাম নির্ধারিত সময় পর্যন্ত, যেটুকু পর্যন্ত তাদের পৌঁছানো উদ্দেশ্য ছিল, তখন তারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে লাগলো। (সূরা আ'রাফ, আয়াত: ১৩৪-১৩৫)

আযাব যেভাবে ফেরাউনের কওমকে ধ্বংস করলো

ক্রমাগত এতবার পরীক্ষা ও অবকাশ দানের পরেও যখন ফেরাউনের সম্প্রদায়ের মধ্যে বোধোদয়ের সৃষ্টি হয়নি, তখন তাদের উপর আবর্তিত হয় চূড়ান্ত ও সর্বশেষ আযাব এবং তাতে তারা ধ্বংস হয়ে যায়। তা এভাবে আসে যে, আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে মুসা 'আলাইহিস সালামও তার সম্প্রদায় ফেরাউন ও তার জাতি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সেদেশ ছেড়ে রওয়ানা হন। তখন ফেরাউন ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা

নিজেদের ঘর-বাড়ি, জমি-জমা ও আসবাবপত্র সবকিছু রেখে হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালাম ও বনী ইসরাইলের অনুসরণের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে।

এ সম্বন্ধে তাফসিরে রুহুল মাআনীতে বর্ণিত আছে, হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালাম আল্লাহর নির্দেশে রাতের সূচনাভাগে বনী ইসরাইলকে নিয়ে মিসর থেকে লোহিত সাগরের দিকে অর্থাৎ মিসরের পূর্বস্থ এলাকা শামদেশের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যান।

বনী ইসরাইলের সংখ্যা তখন ছয় লাখ তিন হাজার এবং অন্য রেওয়ায়েত অনুযায়ী ছয় লাখ সত্তর হাজার ছিল। এগুলো ইসরাইলী রেওয়ায়েত বিধায় অতিরঞ্জিত হতে পারে। তবে কুরআনে কারিম ও হাদীস থেকে এতটুকু তথ্য প্রমাণিত যে, তাদের বারটি গোত্র ছিল এবং প্রত্যেক গোত্রের জনসংখ্যা ছিল বিপুল।

বস্তুত হযরত ইউসুফ ‘আলাইহিস সালামের আমলে বনী ইসরাইল যখন মিসরে আগমন করে, তখন তারা বারো ভাই ছিল। সেই বারো ভাইয়ের বারো গোত্রের এতো বিপুলসংখ্যক লোক মিসর থেকে বের হলো, তাদের সংখ্যা ছয় লাখেরও অধিক বর্ণনা করা হয়।

ফেরাউন তাদের মিসর ত্যাগের সংবাদ সম্বন্ধে অবগত হয়ে নিজ সৈন্যবাহিনীকে একত্র করলো এবং মুসা ‘আলাইহিস সালাম ও তার সম্প্রদায়কে পাকড়াও করার জন্য ধাওয়া করলো। ফেরাউনের সাথে সত্তর হাজার কৃষ্ণবর্ণের ঘোড়া ছিল এবং অগ্রবর্তী বাহিনীতে সাত লাখ সওয়ার ছিল।

পিছন দিকে ফেরাউন ও তার সেনাবহর এবং সামনে লোহিতসাগর দেখে বনী ইসরাইল ঘাবড়ে গেল। তাই তারা মুসা ‘আলাইহিস সালামকে বললো,

إِنَّا لَمُدْرَكُونَ

“আমরা ধরা পড়ে গেলাম”। (সূরা শুআরা, আয়াত: ৬১)

তখন মুসা ‘আলাইহিস সালাম তাদের সান্তনা দিয়ে বললেন,

إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ○

“আমার সাথে আমার পালনকর্তা আছেন। তিনি আমাকে পথ দেখাবেন”। (সূরা শুআরা, আয়াত: ৬২)

এরপর মুসা ‘আলাইহিস সালাম আল্লাহ তা‘আলার নির্দেশে সমুদ্রে লাঠি দিয়ে আঘাত করলেন। ফলে সঙ্গে সঙ্গে তাতে বারোটি রাস্তা নির্মিত হয়ে গেল এবং সাগরের পানি প্রাচীরের মতো দণ্ডায়মান হয়ে থাকলো। তখন বনী ইসরাইলের বারোটি গোত্র এসব সড়ক দিয়ে সমুদ্র পার হয়ে গেল। কুরআনুল কারীমে এ সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে,

فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ ۖ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ○ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ ○ وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ ○

অর্থঃ অতঃপর আমি মুসা ‘আলাইহিস সালামকে আদেশ করলাম, আপনি নিজের লাঠি দিয়ে সমুদ্রে আঘাত করুন। ফলে সঙ্গে সঙ্গে তা বিদীর্ণ হয়ে গেল এবং প্রত্যেক ভাগ বিশাল পর্বতসদৃশ্য হয়ে গেল। আর সেখানে অপর দলকে (ফেরাউনের বাহিনী) পৌঁছে দিলাম। আর আমি হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালাম ও তার সঙ্গীদের সবাইকে বাঁচিয়ে দিলাম। (সূরা শুআরা, আয়াত: ৬৩-৬৫)

ফেরাউন ও তার সৈন্যবাহিনী সমুদ্রের কাছে পৌঁছে এই বিস্ময়কর দৃশ্য দেখে হতভম্ব হয়ে গেল। সমুদ্রের বুকে এই রাস্তা কীভাবে তৈরি হলো? কিন্তু এর পরেও ফেরাউন তার সৈনিকদের সগর্বে বললো, এগুলো আমার প্রতাপের লীলা। এর কারণে সমুদ্রের স্রোত বন্ধ হয়ে রাস্তা তৈরি হয়ে গিয়েছে। এ কথা বলে সে সামনে অগ্রসর হয়ে নিজের ঘোড়া সমুদ্রের পথে চালিয়ে দিলো এবং গোটা সৈন্যবাহিনীকে তার পেছনে পেছনে আসার জন্য আদেশ দিলো।

যখন ফেরাউন তার সৈন্যবাহিনীসহ সমুদ্রপথের মাঝখানে এসে গেল এবং একটি লোকও তীরে বাকি রইলো না। অপরদিকে বনী ইসরাইল সমুদ্রের অপর তীরে পৌঁছে গেল। তখন আল্লাহ তা'আলা সমুদ্রকে রাস্তা বিলীন করে আগের মতো প্রবাহিত হওয়ার হুকুম দিলেন। সমুদ্রের সকল অংশ পরস্পর মিলে গেল। ফলে ফেরাউন ও তার দলবল লোহিতসাগরের মধ্যে পড়ে অথৈ পানি ও স্রোতের গ্রাসে পরিণত হলো। এ সম্পর্কে কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

فَاَغۡرَقۡنَاهُمۡ فِی الۡیَمِّ بِاَنَّهُمۡ کَذَّبُوۡا بِاٰیَاتِنَا وَکَانُوۡا عَنۡهَا غَافِلِیۡنَ ○ وَاَوۡرَثۡنَا الۡقَوۡمَ الَّذِیۡنَ کَانُوۡا
یُسۡتَضۡعَفُوۡنَ مَشَارِقَ الۡاَرۡضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِیۡ بَارَکۡنَا فِیۡهَا

অর্থঃ তখন আমি তাদের সাগরের মধ্যে ডুবিয়ে দিলাম। কারণ, তারা মিথ্যাপ্রতিপন্ন করেছিল আমার নিদর্শনসমূহ এবং এ সম্পর্কে তারা উদাসীন ছিল। আর আমি উত্তরাধিকারী করে দিলাম সেই কওমকে, যাদের দুর্বল মনে করা হতো সেই যমিনের পূর্ব ও পশ্চিমের অংশসমূহের,

যাতে আমি বরকত স্থাপন করেছিলাম। (সূরা আ‘রাফ, আয়াত: ১৩৬-১৩৭)

অতঃপর ফেরাউন যখন সমুদ্রে হাবুডুবু খেতে আরম্ভ করলো, তখন সে বলে উঠলো, আমি ঈমান আনলাম আল্লাহর উপর, যার উপর বনী ইসরাইল ঈমান এনেছে। তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। পবিত্র কুরআনে এ সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে,

حَتّٰۤى اِذَاۤ اَدۡرَكَهُ الۡغَرَقُ ۙ قَالَ اٰمَنۡتُ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا الَّذِىۡۤ اٰمَنَتۡ بِهٖ بَنُوۡۤا اِسۡرَآءِيۡلَ وَاَنَا مِنَ الۡمُسۡلِمِيۡنَ ○

অর্থঃ এমনকি যখন সে (ফেরাউন) নিমজ্জিত থেকে লাগলো, তখন বললো, আমি ঈমান আনলাম, কোন ইলাহ নেই তিনি ছাড়া, যার প্রতি ঈমান এনেছে বনী ইসরাইল। আমি তারই অনুগতদের দলে। (সূরা ইউনুস, আয়াত: ৯০)

তখন আল্লাহ তা‘আলা ফেরাউনের ঈমান আনার ঘোষণার উত্তরে বলেন,

آٰلۡـٰٔنَ وَقَدۡ عَصَيۡتَ قَبۡلُ وَكُنۡتَ مِنَ الۡمُفۡسِدِيۡنَ

অর্থঃ এতক্ষণে ঈমান এনেছ? অথচ এ যাবত নাফরমানী করে চলেছো এবং ফাসাদকারীদের অন্তর্ভুক্ত থেকেছ! (কিন্তু এখন যে ঈমান আনার এবং ইসলাম গ্রহণের সময় উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে।) (সূরা ইউনুস, আয়াত: ৯১)

এতে প্রমাণিত হয়, ঠিক মৃত্যুকালে যখন প্রাণ হলোকুমে চলে আসে, সেসময় ঈমান আনা শরী‘আত অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য নয়। বিষয়টির আরো বিস্তারিত বিশ্লেষণ সেই

হাদীসের দিয়েও প্রতীয়মান হয়, যাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা‘আলা বান্দার তাওবা ততক্ষণ পর্যন্ত কবুল করেন, যতক্ষণ না তার মৃত্যুর ঊর্ধ্বশ্বাস আরম্ভ হয়ে যায়। (তিরমিযী)

ফেরাউনের ঘটনা পরবর্তীদের জন্য শিক্ষা

মোটকথা, সমুদ্রের গ্রাসের চূড়ান্ত আযাব-গযব দিয়ে ফেরাউন ও তার দলবল সমূলে ধ্বংস হয়ে গেল। প্রচণ্ড দাপট, আত্মক্ষমতা ও মহাপ্রতাপের দাবিদার ফেরাউনের সকল শক্তি ও ঐশ্বর্য খর্ব হয়ে গেল।

তবে ফেরাউনের জীবন খতম হলেও আল্লাহ তা‘আলা ইচ্ছা করলেন, ফেরাউনের মৃতদেহ সংরক্ষিত রেখে দুনিয়াবাসীর জন্য শিক্ষাগ্রহণের বিষয় বানাতে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

فَالْيَوْمَ نُنَجِّيْكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُوْنَ لِمَنْ خَلْفَكَ اٰيَةً ؕ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ اٰيٰتِنَا لَغٰفِلُوْنَ ۝

অর্থঃ অতএব, আজকের দিনে পরিত্রাণ দিচ্ছি আমি তোমার দেহকে, যাতে তুমি তোমার পরবর্তীদের জন্য শিক্ষার বিষয় হতে পারো। আর নিঃসন্দেহে বহুলোক আমার নিদর্শনসমূহের প্রতি লক্ষ্য করে না। (সূরা ইউনুস, আয়াত: ৯২)

উক্ত প্রক্রিয়া এভাবে সংঘটিত হয়েছিল যে, সাগর পাড়ি দেওয়ার পর হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালাম যখন বনী ইসরাইলকে ফেরাউনের নিহত হওয়ার সংবাদ দেন, তখন তারা ফেরাউনের ব্যাপারে এতই ভীত ও সন্ত্রস্ত ছিল যে,

তা অস্বীকার করে বসলো এবং বলতে লাগলো, ফেরাউন সম্ভবত ধ্বংস হয়নি। আল্লাহ তা‘আলা তাদের সঠিক ঘটনা প্রদর্শন এবং অন্যদের শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে একটি ঢেউয়ের মাধ্যমে ফেরাউনের লাশটি সাগরের তীরে এনে ফেলে রাখলেন। তখন সবাই তা প্রত্যক্ষ করলো। এতে তার ধ্বংসের ব্যাপারে তারা নিশ্চিত হলো এবং তার এই লাশ সকলের জন্য শিক্ষাগ্রহণের বিষয় হয়ে রইলো।

তারপর এই লাশের কী পরিণতি হয়েছিল, তা জানা যায়নি। যেখানে ফেরাউনের লাশটি পাওয়া গিয়েছিল, আজও সে স্থানটি ‘জাবালে ফেরাউন’ নামে পরিচিত।

কিছুকাল আগে পত্রিকায় খবর বেরিয়েছে এবং অনেক ঐতিহাসিকও লিখেছেন, ফেরাউনের লাশ অক্ষত অবস্থায় রয়ে গিয়েছে। সাধারণ লোকেরাও তা প্রত্যক্ষ করেছে এবং আজ পর্যন্ত তা কায়রোর যাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। কিন্তু একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না যে, এই ফেরাউনই সেই ফেরাউন, যার সাথে হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালামের মোকাবেলা হয়েছিল, নাকি অন্যকোনো ফেরাউন। কারণ, ‘ফেরাউন’ নামটি কোন একক ব্যক্তির জন্য খাস নয়, বরং সে যুগে মিসরের সকল বাদশাকেই ‘ফেরাউন’ উপাধি দেওয়া হত।

কিন্তু এটাও অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ তা‘আলা যেভাবে ডুবে-যাওয়া লাশটি শিক্ষার উপকরণ হিসাবে সাগরতীরে আছড়ে ফেলেছিলেন, তেমনিভাবে সেটি আগত বিশ্ববাসীর শিক্ষার জন্য পচা-গলা থেকেও রক্ষা করে থাকবেন এবং এখনও তা বিদ্যমান থাকবে।

উল্লিখিত ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের ধ্বংসের ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে আমাদের উপদেশ গ্রহণ করা জরুরী এবং সবধরনের পাপাচার ও অবাধ্যতা ছেড়ে আল্লাহ তা'আলার হুকুম ও তার রাসুলের আদর্শ যথাযথভাবে পালন করা কর্তব্য।

বালআম বাউরার শাস্তি: মুমিনদের জন্য শিক্ষা

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ الَّذِی اٰتَیْنَاهُ اٰیَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَاَتْبَعَهُ الشَّیْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِیْنَ○ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلٰكِنَّهُ اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ الْكَلْبِ اِنْ تَحْمِلْ عَلَیْهِ یَلْهَثْ اَوْ تَتْرُكْهُ یَلْهَثْ ذٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِیْنَ كَذَّبُوْا بِاٰیَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ یَتَفَكَّرُوْنَ○

অর্থঃ আপনি তাদের সেই লোকের বৃত্তান্ত শুনিয়ে দিন, যাকে আমি আমার নিদর্শনাবলী দান করেছিলাম; কিন্তু সে তা উপেক্ষা করে বেরিয়ে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে শয়তান তার পেছনে লেগে গেল। ফলে সে পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। আমি ইচ্ছা করলে সেইসব নিদর্শনের বদৌলতে তার মর্যাদা বাড়িয়ে দিতাম, কিন্তু সে দুনিয়ার প্রতি ধাবিত হয়ে গেল এবং স্বীয় রিপুর অনুগামী হলো। তাই তার অবস্থা হলো কুকুরের মতো। যদি তাকে তাড়া করো, তবু হাঁপাতে থাকে আর যদি ছেড়ে দাও, তবু হাঁপাতে থাকে। এই হলো সেইসব লোকের উদাহরণ, যারা মিথ্যাপ্রতিপন্ন করেছে আমার আয়াতসমূহ। অতএব, আপনি বর্ণনা করুন এসব কাহিনী, যাতে তারা চিন্তা-ফিকির করে। (সূরা আ'রাফ, আয়াত: ১৭৫-১৭৬)

উল্লিখিত আয়াতসমূহে বনী ইসরাইল সম্প্রদায়ের একজন বিজ্ঞ আলেম ও অনুসরণীয় ব্যক্তির ইলম ও আমলের সুউচ্চ

স্তরে পৌঁছার পর এক পর্যায়ে নীতিচ্যুত হওয়ার কারণে গোমরাহ ও অভিশপ্ত হয়ে যাওয়ার একটি দৃষ্টান্তমূলক ঘটনা এবং তার শাস্তির বিবরণ বিবৃত হয়েছে। তাতে মুমিনগণের জন্য বহু শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে।

এই আয়াতগুলোতে ঘটনাটি বর্ণনার শুরুতে ও শেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আপনি নিজ উম্মতকে সেই ঘটনা শুনিয়ে দিন, বনী ইসরাইলের একজন বড় আলেম ও বুযুর্গ আবেদ কামালাতের সুউচ্চ সীমায় পৌঁছেও আল্লাহর অসন্তুষ্টির একটি কাজ করার কারণে কিভাবে ধ্বংসের গহ্বরে পতিত হলো। এতে তারা সতর্ক হবে।

কুরআনে কারীমে সেই লোকের নাম বা কোন পরিচয় উল্লেখ করা হয়নি। তাফসীরবিদ সাহাবা ও তাবেয়ীগণের মাধ্যমে এ ব্যাপারে বিস্তারিত বিবরণ বিভিন্ন রেওয়ায়াতে এসেছে। সেগুলোর মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ও অধিকাংশ আলেমের নিকট গ্রহণযোগ্য হলো হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. এর রেওয়ায়েত। তাতে উল্লেখ করা হয়েছে, সেই লোকটির নাম বালআম ইবনে বাউরা। সংক্ষেপে বলা বালআম বাউরা। সে সিরিয়ায় বায়তুল মুকাদ্দাসের নিকটবর্তী কিনআনের অধিবাসী ছিল। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, সে বনী ইসরাইল সম্প্রদায়ের লোক ছিল।

সে ‘মুসতাজাবুদ দাওয়াত’ ছিল। অর্থাৎ তার প্রত্যেকটি দু‘আ আল্লাহর দরবারে কবুল হতো। সে ইসমে আজমের মাধ্যমে দু‘আ করতো। আল্লাহ তা‘আলার আগে নাযিলকৃত কোন কোন কিতাবের ইলমও তার ছিল। তার গুণ ও

বৈশিষ্ট্যের বর্ণনায় বলা হয়েছে, اَلَّذِیۡۤ اٰتَیۡنٰهُ اٰیٰتِنَا "যাকে আমি আমার নিদর্শনাবলি দান করেছিলাম।" এখানে "আমার নিদর্শনাবলি" দিয়ে তার সেই ইলমের দিকেই ইংগিত করা হয়েছে।

বালআম বাউরার দু'আ ও তার পরিণতি

ফেরাউনের লোহিতসাগরে ডুবে মরা এবং মুসা 'আলাইহিস সালামের মিসর বিজয়ের পর যখন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে হযরত মুসা 'আলাইহিস সালাম ও বনী ইসরাইল কওমকে তৎকালীন জাব্বারিন ও নাফরমান আমালিকা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে জিহাদ করার হুকুম দেওয়া হলো, তখন তারা জিহাদের জন্য সেই সম্প্রদায়ের আবাসস্থলের উপকণ্ঠে সিরিয়ায় পৌঁছুলেন। তাতে জাব্বারিন কওমে আমালিকা দেখলো, হযরত মুসা 'আলাইহিস সালাম সমস্ত বনী ইসরাইল সৈন্যসহ সিরিয়ায় এসে ঘাঁটি স্থাপন করেছেন।

মুসা 'আলাইহিস সালাম ও তার কওমের মোকাবেলায় প্রচণ্ড শক্তিধর ফেরাউন সম্প্রদায়ের লোহিতসাগরে নিমজ্জিত হয়ে মরার কথা পূর্ব থেকেই তাদের জানা ছিল। তাই মুসা 'আলাইহিস সালামের মোকাবেলা করতে তাদের মনে ভয় জন্মালো।

এজন্য তারা চাতুর্যের আশ্রয় নিয়ে ওই এলাকার সবচেয়ে বড় দু'আ কবুলে প্রসিদ্ধ বুযুর্গ আলেম বালআম ইবনে বাউরার কাছে সমবেত হয়ে বললো, মুসা তার বিপুলসংখ্যক সৈন্যসহ আমাদের হত্যা ও দেশান্তর করার জন্য এসেছে। আপনি আমাদের জন্য আল্লাহ তা'আলার দরবারে দু'আ

করুন, যাতে তিনি তাদের আমাদের মোকাবেলা থেকে ফিরিয়ে দেন।

বালআম বললো, তোমরা এ কী বলছো! তিনি হলেন আল্লাহর নবী, তার সাথে রয়েছেন আল্লাহর ফেরেশতাগণ। আমি আল্লাহর নবী ও তার অনুসারীগণের বিরুদ্ধে কেমন করে বদদু‘আ করতে পারি? অথচ আল্লাহ তা‘আলার দরবারে তার যে মরতবা, আমি তা জানি। আমি যদি এ ধরনের জঘন্য কাজ করি, তা হলে আমার দুনিয়া- আখিরাত সবই বরবাদ হয়ে যাবে।

তবু তার সম্প্রদায়ের প্রভাবশালী লোকেরা পীড়াপীড়ি করতে থাকলো। বালআম ইবনে বাউরা বললো, আচ্ছা, তা হলে আমি ইসতিখারা করে দেখি, এ ব্যাপারে দু‘আ করার অনুমতি আছে কিনা? বালআমের নিয়ম ছিল, ইসতিখারা ছাড়া কোন কাজ করতো না। তাই সে নিয়মানুযায়ী বিষয়টি জানার জন্য ইসতিখারা করলো। তাতে স্বপ্নযোগে তাকে এই নির্দেশনা দেওয়া হলো, সে যেন কখনোই নবী ও মুমিনদের বিরুদ্ধে বদদু‘আ না করে।

বালআম তার সম্প্রদায়ের লোকদের স্বপ্নের কথা বললো। বদদু‘আ করতে তাকে বারণ করা হয়েছে। তাই সে কিছুতেই বদদু‘আ করতে পারবে না। তখন সেই সম্প্রদায়ের সমাজপতিরা চিন্তাভাবনা করে তার দরবারে বিপুল পরিমাণ মূল্যবান উপঢৌকন নিয়ে হাজির হলো। তাদের উদ্দেশ্য হলো, এই ঘুষ দিয়ে বশ করে তাকে বদদু‘আ করতে রাজি করানো। তাই যখন সে উক্ত উপঢৌকন দেখে লোভ সামলাতে না পেরে সেগুলো গ্রহণ করে নিলো, তখন

সম্প্রদায়ের লোকেরা জোর আবদার জানালো, আপনাকে এ কাজটি করে দিতেই হবে। এভাবে তাদের আবদার- অনুরোধ ও পীড়াপীড়ি চলতেই থাকলো।

কোন কোন বর্ণনা অনুযায়ী, সে নিজে এসব উৎকোচ গ্রহণ করেনি, বরং তার স্ত্রী উৎকোচ গ্রহণ করে তাদের এ কাজটি করিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয় এবং এজন্য তাকে বুঝাতে থাকে।

তখন স্ত্রীর সন্তুষ্টি, আবেগ ও সম্পদের মোহ তাকে বিভ্রান্ত করে দিল। ফলে সে বদদু‘আ করার উদ্দেশ্যে গাধার উপর সওয়ার হয়ে জিসতান নামক পাহাড়ের দিকে রওয়ানা দিল, যার নিকটে মুসা ‘আলাইহিস সালাম সৈন্যবাহিনীসহ অবস্থান করছিলেন।

পথিমধ্যে তার গাধাটি বারবার বসে পড়তে লাগলো এবং সামনে অগ্রসর হতে অনীহা প্রকাশ করলো। বালআম তাকে অনবরত চাবুক মেরে উঠাতে লাগলো এবং একটু একটু করে অগ্রসর হতে লাগলো। এমনি করে গাধাটিকে বারবার মারতে মারতে সে পেরেশান হয়ে গিয়েছিল। তখন আল্লাহ তা‘আলা তার কুদরতে গাধার যবান খুলে দিলেন। সে বলে উঠলো, ওরে বেওকুফ বালআম, আপনার উপর আফসোস হয়! আপনি কি একবারও ভেবে দেখেছেন, আপনি কোথায় যাচ্ছেন? আপনি তো আমাকে সামনে চালানোর জন্য চেষ্টা করছেন, অথচ ফেরেশতারা সামনে দিক থেকে আমাকে পিছন দিকে ধাক্কা দিচ্ছেন।

বালআম তার গাধাকে কুদরতীভাবে এ ধরনের কথা বলতে দেখে বুঝতে পারলো, একে নিয়ে আর সামনে অগ্রসর

হওয়া সম্ভব নয়। তাই সে গাধাটিকে ওখানেই রেখে পায়ে হেঁটে সেই পাহাড়ে পৌঁছুল।

উক্ত পাহাড়ে উঠে সে হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালাম ও বনী ইসরাইলের বিরুদ্ধে বদদু‘আ করতে আরম্ভ করলো। সে মুহূর্তে আল্লাহ তা‘আলার কুদরতের অপূর্ব কারিশমা দেখা দিল যে, মুসা ‘আলাইহিস সালাম ও তার সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বদদু‘আ করতে গিয়ে বালআম বাউরা যেইসব বাক্য উচ্চারণ করতে চাইলো, সেসবই তার মুখ দিয়ে নিজ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধেই উচ্চারিত হয়ে গেল। তখন তার সম্প্রদায়ের লোকেরা চিৎকার করে বলে উঠলো, বালআম, একি সর্বনাশা কারবার! তুমি যে বনী ইসরাইলের পরিবর্তে উল্টো আমাদের বিরুদ্ধেই বদদু‘আ করছো! তখন বালআম ইবনে বাউরা বললো, “এটা আমার ইচ্ছাকৃত বিষয় নয়। আমি বনী ইসরাইলের বিরুদ্ধেই বলতে চাচ্ছি। কিন্তু আমার জিহ্বা তোমাদের বিরুদ্ধে বলে ফেলছে, যা রোধ করা আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না।”

শেষে তাদের অন্যায় কৃতকর্মের এই পরিণতি হলো, সেই আমালিকা সম্প্রদায়ের উপর আযাবে ইলাহী নাযিল হলো। আর বালআমের পরকালীন শাস্তি তো রয়েছেই। দুনিয়াতেও তাকে এই শাস্তি দেওয়া হলো যে, তার জিহ্বা বেরিয়ে এসে সিনার উপর লটকে গেল। এরপর থেকে তার কোন দু‘আই কবুল হলো না।

যিনার কারণে যেভাবে আযাব এলো

অতঃপর বালআম তাওবা ও অনুশোচনা করার পরিবর্তে ইবলীস শয়তানের দিয়ে আরো বেশি প্ররোচিত হয়ে আরো

ধ্বংসের পথে পা বাড়ালো। সে তার সম্প্রদায়কে বললো, আমার তো ইহকাল-পরকাল সবই বরবাদ হয়ে গেল। আর আমার দু'আও আর চলছে না। এমতাবস্থায় তোমাদের খাতিরে বনী ইসরাইলের ধ্বংসের জন্য আমাকে অন্যকোনো ফন্দি আঁটতে হবে।

এই বলে সে তার সম্প্রদায়ের লোকদের কুপরামর্শ দিয়ে বললো, 'আমি তোমাদের এমন একটি কৌশল বলে দিব, যার দিয়ে তোমরা মুসা 'আলাইহিস সালামের বিরুদ্ধে অনায়াসে জয়ী থেকে পারবে। তোমরা তোমাদের সুন্দরী নারীদের খুব আকর্ষণীয় করে সাজিয়ে কোন কিছু বিক্রি করার বাহানায় বনী ইসরাইলের সৈন্যদের মাঝে পাঠিয়ে দাও। সেই সাথে তাদের একথাও ভালোভাবে বুঝিয়ে দিবে যে, বনী ইসরাইলের সৈন্যরা তাদের সাথে যা-কিছুই করতে চাইবে, জাতির স্বার্থে তারা যেন তা অবাধে করতে দেয়; কোন রকম বাধা যেন না দেয়। এরা মুসাফির, লম্বাদিন যাবত ঘরছাড়া; হয়তো এরা এই অবস্থায় ব্যভিচারে জড়িয়ে পড়বে। এতে তাদের ধ্বংস অনিবার্য হয়ে যাবে। কেননা, আল্লাহ তা'আলার নিকট ব্যভিচার অত্যন্ত ঘৃণিত কাজ। যে জাতির মাঝে তা অনুপ্রবেশ করে, তাদের উপর আল্লাহর গজব ও অভিসম্পাৎ পতিত হয়। তারা কখনও বিজয় বা সাফল্য লাভ করতে পারে না। তখন তোমরা-ই বিজয়ী হবে এবং তাদের মোকাবেলা থেকে মুক্তি পাবে।

বালআমের এই পৈশাচিক চালটি আমালিকা সম্প্রদায়ের খুব মনঃপূত হলো। সে মতেই তারা কাজ করলো। তারা তাদের সুন্দরী মেয়েদের খুব আকর্ষণীয় করে সাজিয়ে বনী

ইসরাইলের সৈন্যদের মাঝে ফেরিওয়ালী হিসাবে পাঠিয়ে দিল।

ঘটনাক্রমে শয়তানের ধোঁকায় পড়ে বনী ইসরাইলের যামযাম ইবনে শালুম নামক এক সরদার এই চালের শিকার হয়ে গেল। হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালাম তাকে সহ সকলকে এই দুষ্কর্ম থেকে বারণ করলেন এবং শত্রুদের গভীর ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সতর্ক করলেন। কিন্তু সে তার সতর্কবাণীর প্রতি ভ্রুক্ষেপ করলো না। বরং কওমে আমালিকার পৈশাচিক ফাঁদে জড়িয়ে পড়ল এবং ব্যভিচারে লিপ্ত হলো।

ফলে সঙ্গে সঙ্গে বনী ইসরাইলের মাঝে খোদায়ী গজবরূপে কঠিন প্লেগ রোগ ছড়িয়ে পড়লো। ফলে একই দিনে সত্তর হাজার ইসরাইলী সৈন্য মৃত্যুমুখে পতিত হলো।

তখন বনী ইসরাইল সম্প্রদায়কে এই বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য হযরত হারুন ‘আলাইহিস সালামের দৌহিত্র ও হযরত মুসা ‘আলাইহিস সালামের দেহরক্ষী বীর মুজাহিদ ফাহহাস উক্ত অপকর্ম সম্পর্কে অবগত হয়ে নিজ অস্ত্রসহ যামযাম ইবনে শালুমের তাঁবুতে প্রবেশ করলেন এবং সেই পাপাচারী যামযাম ও যার সাথে সে অপকর্মে লিপ্ত হয়েছিল, তাকে হত্যা করে ফেললেন। আর বললেন, আল্লাহ তা‘আলা এই ব্যক্তির কারণে আমাদের সকলকে গজব দিয়ে ধ্বংস করে দিচ্ছেন।

তাদের নিহত হওয়ার পর ইসরাইলীরা ঐ দুজনের লাশ প্রকাশ্যে ঝুলিয়ে রাখলো, যাতে অন্যরা শিক্ষাগ্রহণ করতে পারে। অতঃপর তারা সবাই আল্লাহ তা‘আলার দরবারে

কায়মনোবাক্যে তাওবা-ইসতিগফার করলো। তখন সেই প্লেগ গজব দূর হলো।

অতঃপর মুসা ‘আলাইহিস সালাম কওমে আমালিকাকে পরাস্ত করে সেই এলাকাকে নাফরমানী থেকে মুক্ত করলেন।

আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গঃ এক

আয়াতে বালআম ইবনে বাউরার জ্ঞান ও প্রজ্ঞা সম্পর্কে প্রথমত বলা হয়েছে, الَّذِیْٓ اٰتَیْنٰهُ اٰیٰتِنَا “যাকে আমি আমার নিদর্শনাবলি দান করেছিলাম।”

অতঃপর বলা হয়েছে, فَانْسَلَخَ مِنْهَا “কিন্তু সে তা থেকে বেরিয়ে গেছে।” (সূরা আ‘রাফ, আয়াত: ১৭৫)

এই فَانْسَلَخَ শব্দটি প্রকৃতপক্ষে পশুর চামড়া ছাড়ানোর দিয়ে চামড়ার ভেতর থেকে পশুর দেহ বের হওয়া কিংবা সাপের (ছলম ছাড়ানোর ফলে) ভেতর থেকে তার দেহ বেরিয়ে আসার ক্ষেত্রে বলা হয়। এখানে আল্লাহর নিদর্শনাবলির জ্ঞানকে একটি পোশাক বা লেবাসের সাথে তুলনা করে বলা হয়েছে, এই লোকটি জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সেই বেষ্টন থেকে সম্পূর্ণরূপে বের হয়ে গিয়েছে। ফলে শয়তান তাকে কাবু করে ফেলেছে। এর দরুন সে পথ পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছে। আয়াতের পরবর্তী অংশে সেই কথাই ব্যক্ত করা হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

فَاَتْبَعَهُ الشَّیْطٰنُ فَكَانَ مِنَ الْغٰوِیْنَ

অর্থঃ তাই শয়তান তার পেছনে লেগেছে। ফলে সে পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছে। (সূরা আ‘রাফ, আয়াত: ১৭৫)

এখানে একথা বুঝানো হয়েছে, যে পর্যন্ত আল্লাহর নিদর্শনাবলির জ্ঞান তথা কিতাবের ইলম ও আল্লাহর স্মরণ তার সাথে ছিল, সে পর্যন্ত শয়তান তার উপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। কিন্তু স্ত্রীর মুহাব্বতে ও দুনিয়ার সম্পদের মোহে যখন তা শেষ হয়ে গেল, তখন শয়তান তাকে কাবু করে ফেললো। যদ্দরুন সে পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।

আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গঃ দুই

কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে,

وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلٰكِنَّهٗٓ اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ

অর্থঃ আমি ইচ্ছা করলে, সেই নিদর্শনাবলীর বদৌলতে তাকে উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন করে দিতাম। কিন্তু সে পার্থিব জগতের চাকচিক্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গিয়েছে এবং নিজ প্রবৃত্তির দাসত্ব করতে শুরু করেছে।

এই আয়াতে اَخْلَدَ শব্দটি إِخْلَاد থেকে উদ্ভুত। এর অর্থ কোন কিছুর প্রতি আকৃষ্ট হওয়া কিংবা কোন স্থান আঁকড়ে ধরা। আর أَرْض এর প্রকৃত অর্থ ভূমি। পৃথিবীতে যা-কিছু রয়েছে, সেই যাবতীয় সম্ভার হয়তো সরাসরি ভূমি, না হয় ভূমিসংক্রান্ত বিষয়-বৈভব, যেমন, ঘর-বাড়ি, ক্ষেত-খামার ইত্যাদি, কিংবা যমিন থেকেই উৎপন্ন অন্যান্য সামগ্রী, যেগুলোর মাধ্যমে মানুষ জীবন-যাপনের অবলম্বন ও সুখ-শান্তি লাভ করে থাকে। সুতরাং أَرْض শব্দ দিয়ে এখানে পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদ-সম্ভারই বুঝানো হয়েছে।

উল্লিখিত আয়াতে এদিকে ইংগিত করা হয়েছে, আল্লাহপ্রদত্ত নিদর্শনাবলী ও তার জ্ঞান-ইলমই হলো প্রকৃত ইজ্জত-সম্মান ও সফলতার চাবিকাঠি। কিন্তু যে ব্যক্তি এসব খোদায়ী নিদর্শন ও জ্ঞানের যথার্থ সম্মান না দিয়ে পার্থিব কামনা-বাসনাকে এর উপর প্রাধান্য দিবে, তার জন্য এই ইলম-গুণই মহাবিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে এবং সে ইহকাল ও পরকালে আল্লাহ তা‘আলার কঠিন শাস্তি ও আযাবে নিপতিত হবে।

আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গঃ তিন

বালআম ইবনে বাউরার পরকালীন শাস্তি যে কত ভয়াবহ হবে, তা মহান আল্লাহই জানেন। তার প্রতি তাৎক্ষণিক দুনিয়ার যে শাস্তি আরোপিত হয়েছিল, সে সম্পর্কে আয়াতের পরবর্তী অংশে বলা হয়েছে,

اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ اَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ

অর্থঃ তার অবস্থা হলো কুকুরের মতো, যদি তাকে তাড়া করো, তবু হাঁপাবে, আর যদি তাকে ছেড়ে দাও, তবু হাঁপাবে। (সূরা আ‘রাফ, আয়াত: ১৭৬)

এই আয়াতে উল্লিখিত يَلْهَثْ শব্দের প্রকৃত অর্থ হলো জিহ্বা বের করে ছেড়ে দিয়ে জোরে শ্বাস নেওয়া।

একথা সর্বজনবিদিত যে, সকল প্রাণীই নিজের জীবন রক্ষার জন্য ভেতরের উষ্ণ বায়ু বাইরে বের করে দেয় এবং বাইরে থেকে নতুন তাজা বায়ু নাক-মুখের মাধ্যমে ভেতরে টেনে নেয়। এই শ্বাস-নিঃশ্বাসের গ্রহণ ও ত্যাগের উপরই প্রতিটি প্রাণীর জীবন নির্ভরশীল। আর মহান আল্লাহ-ই প্রত্যেক

জীবের জন্য এ কাজটি অত্যন্ত সহজ ও সাবলীল করে দিয়েছেন যে, কোন ইচ্ছা বা পরিশ্রম ছাড়াই প্রতিটি প্রাণীর নাকের রন্ধ্র দিয়ে ভেতরের হাওয়া বাইরে এবং বাইরের হাওয়া ভেতরে আসা-যাওয়া করছে। এতে না কোন শক্তিপ্রয়োগের দরকার হয় আর না ইচ্ছা করে করার প্রয়োজন পড়ে। বরং স্বাভাবিক ও স্বভাবগতভাবেই এ কাজটি ক্রমাগতভাবে সম্পন্ন হতে থাকে।

তবে জীব-জন্তুর মধ্যে কুকুর এর ব্যতিক্রম। কেবল কুকুরই এমন জীব, যাকে শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়ার জন্য জিহ্বা বের করে জোর দিতে হয় এবং পরিশ্রম করতে হয়।

অন্যান্য জীব-জন্তুর বেলায় এমন অবস্থা তখনই সৃষ্টি হয়, যখন তাদের প্রতি কেউ চড়াও হয় কিংবা সে ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে অথবা আকস্মিক কোন বিপদ-আপদের সম্মুখীন হয়। কিন্তু কুকুরের উপর এই অবস্থা সর্বক্ষণই থাকে, তার উপর চড়াও হলেও কিবা তাকে ছেড়ে দিলেও।

উল্লিখিত আয়াতে বালআম ইবনে বাউরাকে কুকুরের সাথে তুলনা করা হয়েছে। সে আল্লাহ তা‘আলার আয়াতসমূহের জ্ঞান ও পরিচয় লাভ করার পরও তার উপর নিজ প্রবৃত্তি ও দুনিয়ার লোভকে প্রাধান্য দিয়ে আল্লাহ তা‘আলার নির্দেশ অমান্য করেছিল। ফলে তাকে এই শাস্তি দেওয়া হয়েছিল যে, তার জিহ্বা কুকুরের জিহ্বার মতো বেরিয়ে গিয়ে বুকের উপর ঝুলে পড়েছিল এবং তাতে সে অনবরত কুকুরের মতো হাঁপাতে থাকতো। তাকে কেউ তাড়া করুক বা না করুক, সর্বাবস্থায় সে শুধু কুকুরের মতো হাঁপাতেই থাকতো। সেই সাথে তার দু‘আ কবুলের মর্যাদা ও বুযুর্গীর মরতবা

উঠিয়ে নেওয়া হয়েছিল এবং সে চরম অধঃপতনের শিকার হয়েছিল।

বালআম বাউরার ঘটনা থেকে শিক্ষা

উল্লিখিত আয়াতে বর্ণিত ঘটনার বিবরণী থেকে আমরা এই শিক্ষা অর্জন করতে পারি।

১. কারো পক্ষেই নিজের জ্ঞান-গরিমা ও ইবাদত-বন্দেগীর ব্যাপারে তুষ্ট ও নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত নয়। কারণ, শয়তান সর্বদা মানুষের পেছনে লেগে আছে। যেকোনো সময় তাকে ধোঁকা দিয়ে পথচ্যুত করে দিতে পারে। যেমন ঘটেছে বালআম ইবনে বাউরার ক্ষেত্রে।

তাই শয়তানের ধোঁকা থেকে সর্বদা সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে এবং কোনক্রমেই শরী'আতের নির্দেশ থেকে একচুলও সরা যাবে না। সেই সাথে আল্লাহ তা'আলার শোকরগুযারি ও সিরাতে মুসতাকীমের উপর কায়েম ও দায়েম থাকার জন্য আল্লাহর দরবারে দু'আ করা এবং কেবল তারই উপর ভরসা করা একান্ত কর্তব্য।

২. এমন সব পরিবেশ ও কার্যকলাপ থেকে খুব সতর্কতার সাথে বেঁচে থাকা জরুরী, যেগুলোতে দীনী ব্যাপারে কোনরূপ ক্ষতির আশংকা থাকে। বিশেষ করে স্ত্রী, ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততির মায়া ও মোহে ফেলে কখনো যেন শরী'আতের হুকুম থেকে কোনরূপ বিচ্যুতি না ঘটে, সে ব্যাপারে খুব সাবধান থাকতে হবে। এর অশুভ পরিণতির কথা সর্বক্ষণ স্মরণ রাখতে হবে।

স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির মুহাব্বত দোষের নয়; বরং শরী'আতের গণ্ডির মধ্যে তা কাম্য, তবে তাদের কারণে যেন কখনো আল্লাহর হুকুমের বরখেলাফ করা না হয়। বিশেষ করে স্ত্রীর বৈধ-অবৈধ সকল দাবি রক্ষা করা। সুতরাং এ ব্যাপারে শরী'আতের বিধি-বিধান জেনে তার প্রতি প্রাধান্য দেওয়া কর্তব্য। তা না হলে আল্লাহর নাফরমানীর কারণে দুনিয়া ও আখিরাতে চরম ক্ষতির সম্মুখীন হবে।

৩. অসৎ ও ভ্রষ্ট লোকদের সাথে সম্পর্ক রাখা এবং তাদের নিমন্ত্রণ বা হাদিয়া-তোহফা গ্রহণ করা থেকেও বেঁচে থাকা আবশ্যক। নিজ সম্প্রদায়ের পথভ্রষ্ট লোকদের উপঢৌকন গ্রহণ করার কারণেই তো বালআম ইবনে বাউরা পথচ্যুত হয়ে পড়েছিল।

৪. অশ্লীলতা ও পাপাচার গোটা জাতির জন্য ধ্বংস ও বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই সেই ধ্বংস ও বিপর্যয় থেকে রক্ষা পেতে হলে, দেশ ও সমাজকে যাবতীয় বেহায়াপনা ও অশ্লীলতার পথ পরিহার করতে হবে এবং দেশ থেকে পাপাচার ও এর উপকরণাদি সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করতে হবে। তা না হলে গোটা জাতির উপর আল্লাহর শাস্তি ও গজব নাযিল হবে, যেমন হয়েছিল বনী ইসরাইলের উপর। যিনা-ব্যভিচারের কারণে তাদের মধ্যে প্লেগ রোগের গজবের দ্বারা একদিনেই সত্তর হাজার লোককে আল্লাহ তা'আলা ধ্বংস করে দিয়েছেন।

তাই আমাদের দেশে অশ্লীল কর্মকাণ্ডের যতরকম পন্থা ও উপকরণ রয়েছে, যেমন, অশ্লীল গান-বাদ্য, অশ্লীল

মিডিয়া, পর্ন মুভি ও ম্যাগাজিন, রেডিও, টিভি চ্যানেল ও সিনেমা- থিয়েটার প্রভৃতির অশ্লীলতা ও মহিলাদের বেপর্দা চলাফেরা ও মোবাইল ফোনে ছেলেমেয়েদের ভ্রষ্টতা, প্রেমবিনিময়, নাজায়েয কথাবার্তা ও ক্যামেরা মোবাইলে নানান অশ্লীল ছবির প্রকোপ ইত্যাদি থেকে নিজেদেরও বাঁচতে হবে এবং দেশ ও সমাজকেও বাঁচাতে হবে। তা না হলে এর পরিণামে দুনিয়ায় ও আখিরাতে বিভিন্ন আযাব-গজবে পাকড়াও হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

পবিত্র কুরআনে পূর্বযুগের নসীহতমূলক সকল ঘটনা বর্ণনা করে আল্লাহ তা'আলা আমাদের সতর্ক করছেন, যেন আমরা সেইযুগে নাফরমানদের মতো নাফরমানীতে লিপ্ত না হই। তা হলেই যাবতীয় গজব ও শাস্তি থেকে আমরা বাঁচতে পারবো এবং আমাদের সঠিক জীবনে আল্লাহ তা'আলার বিধান পরিপূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করার দিয়ে আমরা দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা লাভ করতে পারবো।

সমাপ্ত